ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● সহ-সম্পাদক শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● সম্পাদকীয় পরামর্শক পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● অনুবাদক স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● প্রুফ সংশোধক সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● প্রবন্ধক জয়ন্ত চৌধুরী ● প্রচ্ছদ/ডিটিপি শ্রবণ ধারা ● হিসাব রক্ষক বিদ্যাধর দাস ● গ্রাহক সহায়ক জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● সৃজনশীলতা রঙ্গীগৌর দাস ● প্রকাশক ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে সত্যদর্শী নন্দা দ্বারা প্রকাশিত ● অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭, মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (বুক পোস্ট) ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (রেজিস্ট্রি পোস্ট) ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (ক্যুরিয়ার সার্ভিস) ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৯ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

৪৩ বর্ষ ▪ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ▪ হৃষীকেশ ৫৩৩ ▪ আগস্ট ২০১৯

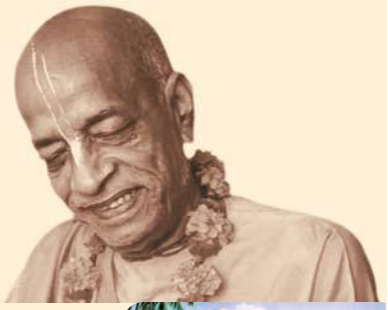

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

ভগবৎ-দর্শন

শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বর্তমান। কিন্তু তাঁকে দর্শন করার জন্য আপনাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রে সেটি বর্ণিত আছে। সেই সকল সাধু ব্যক্তি যারা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমময় ভাবাবেশে অবস্থান করেন তারা তাঁকে সর্বদা দিনের চব্বিশ ঘন্টাই দর্শন করেন।

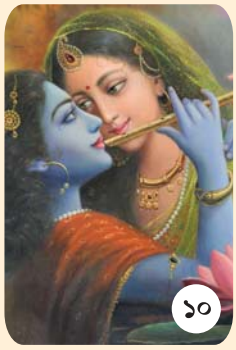

১০ কাহিনী

সত্যভামা কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তিকে ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিমাপ করেছিলেন

যদি আমরা কৃষ্ণের করুণা প্রাপ্ত করতে চাই তাহলে আমাদের হৃদয়কে নির্মল করতে কঠোর পরিশ্রমের সাথে ভগবানের দিব্যনাম জপ করতে হবে, চিত্তকে প্রেমভক্তি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে এবং তখনই আমরা রুক্মিনী মাতার ন্যায় আমাদের নিস্কাম প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত করতে পারবো।

২৩ আদর্শ জীবন

আন্তরিকতা

তাই আন্তরিকভাবে যখন আমরা প্রচেষ্টা করব, ভাবগ্রাহী জনার্দন তাঁর কৃপা বলে আমার পক্ষে সব অসাধ্য সাধন করবেন। অপর পক্ষে ভণ্ড সাধুরা চিরকালই ব্যর্থ হবে।

২৫ পরিচয়

ব্রজধাম দর্শন

ষোলো হাজারেরও অধিক গোপকুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার বাসনায় অগ্রহায়ণ মাসব্যাপী ভোরবেলায় এখানে এসে যমুনাজলে স্নান সেরে বালুময়ী কাত্যায়নী প্রতিমা নির্মাণ করে সুগন্ধিমালা, ধূপ, দীপ, ফুল, ফল, তণ্ডুলাদি উপহার দিয়ে কাত্যায়নীর পূজা করেছিল।

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী

আপনার নাম কীর্তনের মান উন্নয়নের রহস্য

মহাপ্রভু কৃষ্ণের নিকট পৌছানোর জন্য কীর্তনকে সর্বাধিক কার্যকরী পথ বলে বর্ণনা করেছেন। 'মাধ্যম' কথার বাংলা শব্দ 'উপায়'। এর অর্থ এমন কিছু যার দ্বারা আপাত দৃষ্টিতে দুষ্প্রাপ্যকেও প্রাপ্ত করা যায়।

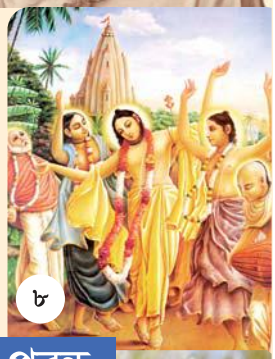

১৬ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

পরমেশ্বর ভগবানের সেবা আর দেবদেবীর উপাসনা একই পর্যায়ে হতে পারে না; কারণ দেবোপাসনা হচ্ছে প্রাকৃত আর ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। সকল দেবদেবী ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ভগবানই সকলের প্রভু এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রূপে প্রকটিত —

প্রবন্ধ

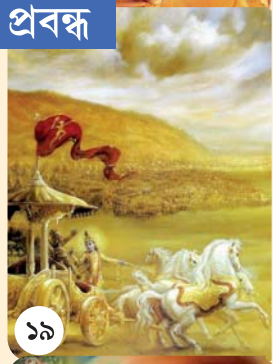

২৯ উৎসব

অজন্মা শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন

গোকুলে নন্দপুত্রের জন্ম সংবাদে গোকুলবাসীরা আনন্দিত। একদিন গর্গ মুনি নন্দভবনে এসে নন্দপুত্রের নামকরণ করলেন। তিনি বললেন চারিযুগে এই শিশু শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু বর্তমানে দ্বাপরের অবসানে কৃষ্ণরূপ হয়েছে। তাই কৃষ্ণ নামে খ্যাত হবে।

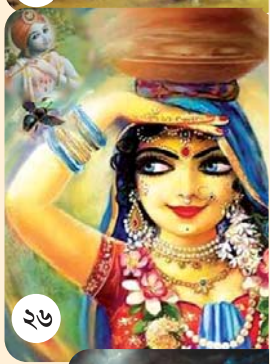

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

সমুদ্র মন্থন কালে অমৃত উঠল। সেই অমৃত দেবতারা পান করে অমর হলেন। কিন্তু দেবপত্নীরা তো অমৃত পান করতে পারেন নি। তাদের গতি কি হবে?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

ডাল পনির

১৪ ইসকন সমাচার

দ্যা ইনস্পায়ার শো হচ্ছে জিমি ফেলনকে ইসকনের উত্তর

২১ ছোটদের আসর

গোপাল পৃথিবীর পরিমাপ করেছিলেন

৩১ ভক্তি কবিতা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সংবাদ

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

আপনার মন কি এখনো একাকী?

যমুনাতীরে কৃষ্ণসনে গোপীরা অত্যন্ত সুখী এবং তৃপ্ত ছিল। তারা কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম ছিল, কৃষ্ণ তাদের প্রেম, কৃষ্ণ তাদের জীবন এবং আজ রাস নৃত্যের দিনে তারা কৃষ্ণের অবিচ্ছিন্ন মনোনিবেশ অনুভব করছিল। তারা তাদেরকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করছিল এবং এও ভাবছিল যে, কৃষ্ণের অন্যান্য ভক্তদের তুলনায় তারা বিশেষ এবং উত্তম ভক্ত। ব্রজধাম এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বোত্তম স্থান যেখানে কৃষ্ণ হচ্ছেন রাজা এবং শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন রানী। এখানে মিথ্যা অহংকারের অবস্থানের অনুমতি নেই। তাই কৃষ্ণ যখন গোপীদের মনে কিঞ্চিত এরূপ অহংকার দর্শন করলেন তখন মুহূর্তের মধ্যে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। গোপীরা তখন বিধ্বস্ত হয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতা অনুধাবন করতে পারলেন এবং উন্মাদের ন্যায় তারা কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে অন্বেষণ করতে লাগলেন।

গোপীরা ছিলেন কৃষ্ণের সর্বোত্তম ভক্ত, তাই মিথ্যা অহংকার কোন রূপেই তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর এই লীলার মাধ্যমে তাঁদের প্রেমভক্তিকে বৃদ্ধি করতে এবং তাদের তীব্র একাত্মতাকে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। ভগবান কেশব গোপীদের অত্যধিক প্রেমগর্ব এবং সৌভাগ্য দেখে, তাদের এই গর্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং পরে আরও অধিক কৃপা করেন। তাই তিনি মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। (ভা ১০। ২৯। ৪৮)

ভগবান কৃষ্ণ এই লীলার মাধ্যমে আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করতে চেয়েছেন যে, যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করতে চাই তাহলে আমাদের হৃদয়কে মিথ্যা অহংকারের কলুষমুক্ত করতে হবে।

কৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে (১৬। ৪) প্রাঞ্জল ভাবে সতর্ক করেছেন যে, মিথ্যা অহংকার হচ্ছে আসুরিক গুণ। তাই তিনি যখন এই গুণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে দর্শন করেন তৎক্ষণাৎ তাঁর কৃপাও অন্তর্হিত হয়।

অহংকার আমাদেরকে অহমিকার মার্গে নিয়ে যায় যেখান থেকে আমরা ভাবতে শুরু করি যে, অপরের অপেক্ষা আমি উত্তম। কিন্তু পারমার্থিক জগতে কেউই নিজেকে অন্যের তুলনায় উত্তম বলে মনে করে না। এমনকি অন্যের থেকে উত্তম হওয়ার প্রয়াসও করে না। কেউ অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত নয়, সেখানে একে অপরকে উত্তম অথবা অধম প্রমাণ করার কোন প্রতিযোগিতা নেই।

প্রকৃতপক্ষে ব্রজধামে প্রত্যেক ভক্ত একত্রিত হয়। একে অপরকে সহযোগিতা করে যাতে করে তারা কৃষ্ণকে সর্বোত্তম সন্তুষ্টি প্রদান করতে পারে। তারা প্রত্যেকেই প্রেম ভাবের সহিত সেবা করে এবং তীব্রভাবে কামনা করে যে, অন্যান্য ভক্তরাও যেন কৃষ্ণের অসীম কৃপা প্রাপ্ত হয়। এই ভাবটিই কৃষ্ণকে পরম সুখ প্রদান করে।

তাই আমরা যখন আশা করি যে, কৃষ্ণ আমাদের ওপর অপার করুণা বর্ষণ করবেন তখন অতি সত্ত্বর আমাদের হৃদয়কে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, সেখানে কোনও মিথ্যা অহংকারের অস্তিত্ব নেই তো! আর তা যদি থাকে তাহলে কৃষ্ণ কিভাবে সেখানে আসবেন এবং কলুষমুক্ত পরিবেশে অবস্থান করবেন। ফল স্বরূপ, আমাদের হৃদয় সর্বদাই শূন্য থাকবে। তাই কৃষ্ণকে আমাদের হৃদয়ে নিবাস করার জন্য আহ্বান করার পূর্বে আমাদের হৃদয়কে সমস্ত পাপ (কু-ইচ্ছা, লোভ, ক্রোধ, অহংকার, ঈর্ষা, মায়া এবং মিথ্যা অহমিকা) মুক্ত করতে হবে এবং ধার্মিক গুণাবলী দ্বারা অলংকৃত করতে হবে যাতে করে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে পরমানন্দে আগমন করেন এবং অবস্থান করেন। তাই আসুন, আমরা আমাদের সর্বোত্তম প্রয়াস দিয়ে হৃদয়কে মিথ্যা অহংকারের কলুষ মুক্ত করি এবং একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করি যে, এই সমস্ত আসুরিক প্রবৃত্তি যা আমাদের একাকী করে কৃষ্ণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তা যেন তিনি নিবারণ করেন।

সাক্ষাৎকার, ইসকন, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

ভগবৎ-দর্শন

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

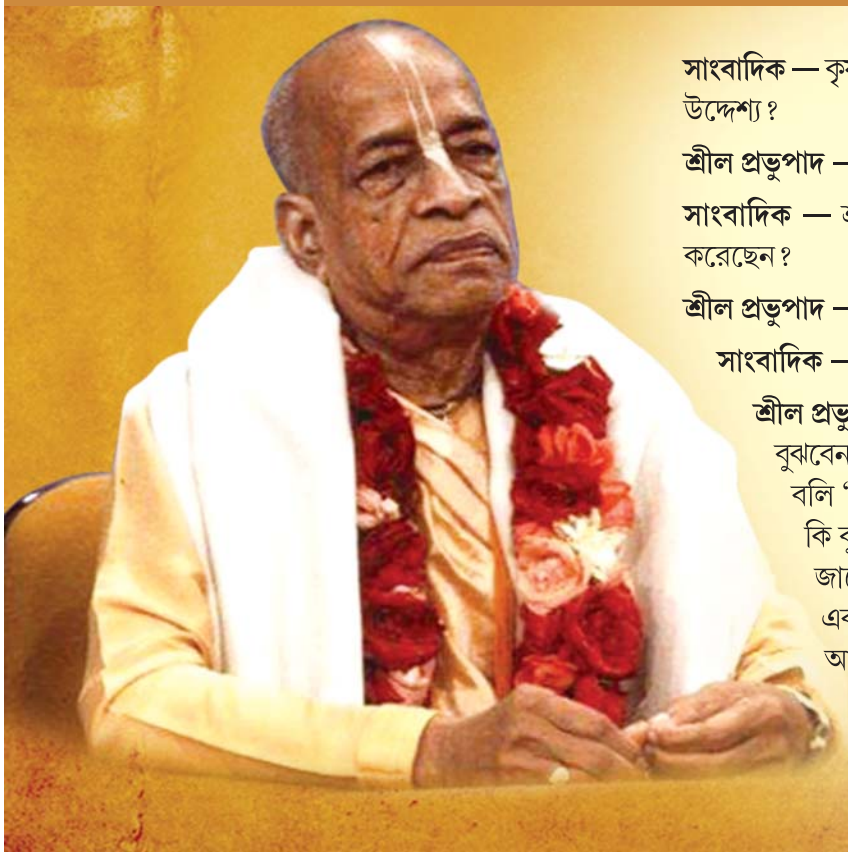

সাংবাদিক — কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি, ভগবৎ উপলব্ধি কি মানব জীবনের উদ্দেশ্য?

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ, সেটিই একমাত্র উদ্দেশ্য।

সাংবাদিক — শ্রীল প্রভুপাদ, আপনি কি ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ — আপনি কি ভাবেন? আপনার কি মত?

সাংবাদিক — আমি বলতে পারব না।

শ্রীল প্রভুপাদ — তাহলে আমি যদি বলি হ্যাঁ, আপনি কি বুঝবেন? যদি আপনি বিশেষজ্ঞ না হন তাহলে যদি আমি বলি 'হ্যাঁ, আমি ভগবৎ উপলব্ধি করেছি' — আপনি কি বুঝবেন? যদি আপনি ভগবৎ উপলব্ধি কি তা না জানেন তাহলে আপনি এই প্রশ্নটি কেন করছেন এবং কিভাবে আপনি উত্তরে সন্তুষ্ট হবেন? সেইজন্য আপনার এই প্রশ্ন করা উচিত নয়। এর কোন অর্থ

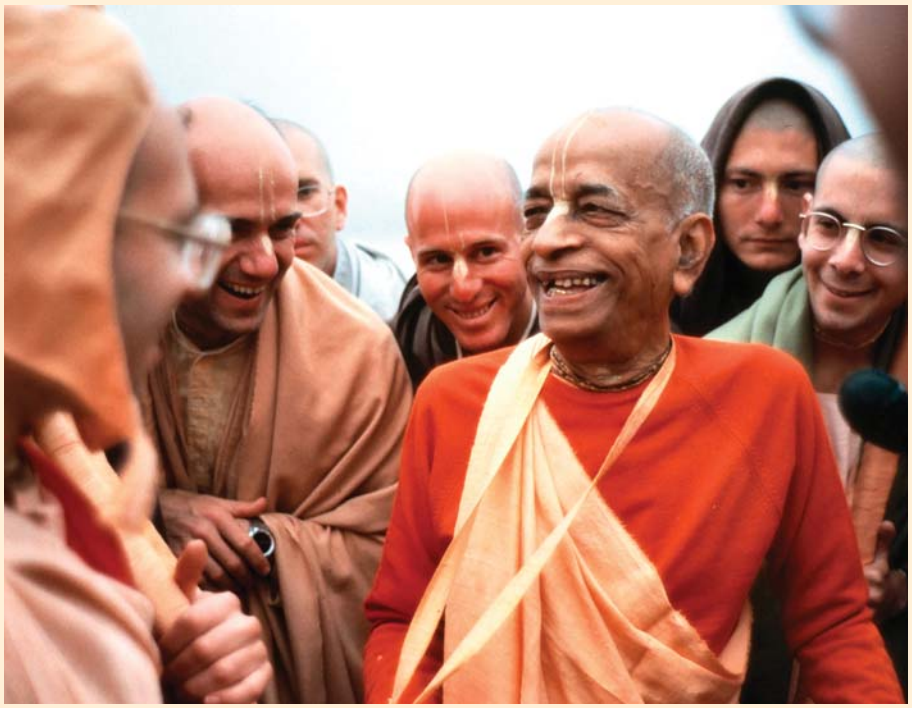

নেই যতক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই আমি যে উত্তর দেব তার জন্য আপনি প্রস্তুত না হন। আপনি কি প্রস্তুত?

সাংবাদিক — হ্যাঁ।

শ্রীল প্রভুপাদ — তাহলে ঠিক আছে। আমি প্রতি মুহূর্তেই ভগবানকে দর্শন করছি। (একটু থেমে) কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি উত্তরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, আপনার এই প্রকার প্রশ্ন করা উচিত নয়।

সাংবাদিক — কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি, ধ্যান কি ভগবৎ উপলব্ধির একটি পথ?

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ, ধ্যান একটি পথ, কিন্তু আপনি এখন ধ্যান করতে পারবেন না কারণ আপনি জানেন না ভগবান কি। সুতরাং কিভাবে আপনি ধ্যান করবেন? প্রথমে আপনাকে জানতে হবে। আমরা ভগবানকে জানি — কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ বলেন, মন্মনা ভব মদ্ভক্তো! 'সর্বদা আমার সম্বন্ধে চিন্তা কর।' সুতরাং আমরা কৃষ্ণ সম্বন্ধে ধ্যান করি। এইটি হলো যথার্থ ধ্যান, কারণ ধ্যানের অর্থ ভগবান সম্বন্ধে চিন্তা করা। কিন্তু যদি আপনি না জানেন ভগবান কি, কিভাবে আপনি তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করবেন?

সাংবাদিক — বিভিন্ন শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন আলো।

শ্রীল প্রভুপাদ — সমস্তই ভগবান। অন্ধকারও ভগবান। আমরা বলি ভগবান হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর থেকে সমস্ত কিছু আসছে। সুতরাং আলোও ভগবান থেকে আসে এবং অন্ধকারও ভগবান থেকে আসে।

সাংবাদিক — আপনি কি মনে করেন যে, আপনার অন্তস্থলে ভগবানকে দর্শন করার একটি পথ হলো ধ্যান?

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ। সেটিই ধ্যানের সংজ্ঞা। যোগী তার মনকে নিবদ্ধ করে অন্তরের ভগবানকে দর্শন করার প্রয়াস করেন। সুতরাং আপনাকে জানতে হবে ভগবান কি। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের ইসকনের কথাই ধরুন। আমার শিষ্যরা জানে ভগবান কি, সেইজন্য তারা ভগবানের কথা চিন্তা করে। কিন্তু আপনার ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। কিভাবে আপনি তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করবেন?

সাংবাদিক — ভক্তিযোগের পথ, ভক্তিযোগই কি বর্তমান যুগের পথ?

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ, ভক্তিযোগই প্রকৃত যোগ। আপনি দেখবেন ভগবদ্গীতায় যোগ প্রক্রিয়া বর্ণনায় ভগবান বলছেন, 'প্রথম শ্রেণীর যোগী হলেন তিনি যিনি সর্বদা আমার — শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন।' সেইজন্য আমাদের শিষ্যদের সর্বদা, দিনের চব্বিশ ঘন্টাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে শেখানো হয়। এই হলো প্রথম শ্রেনীর যোগ।

সাংবাদিক — যদি আপনাকে কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়, আপনাকে প্রথমে সেটি দেখতে হবে। আপনি কি আপনার ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়েছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ — ও, হ্যাঁ, অবশ্যই।

সাংবাদিক — তাহলে ... আচ্ছা ... কৃষ্ণ কি? তিনি কেমন দেখতে?

শ্রীল প্রভুপাদ — দেখুন ... এই তো কৃষ্ণ।

সাংবাদিক — হ্যাঁ, এ তো চিত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ, এটি চিত্র। কিন্তু ধরুন আপনার একটি

ছবি সেখানে আছে। আমি কি সেক্ষেত্রে বলতে পারি না, 'এই হলেন অমুক মহাশয়?'

সাংবাদিক — হ্যাঁ।

শ্রীল প্রভুপাদ — তাহলে এক্ষেত্রে ভুল কোথায়। আপনার ছবি কি আপনি নন?

সাংবাদিক — হ্যাঁ তা ঠিক।

শ্রীল প্রভুপাদ — অনুরূপভাবে এই হলো কৃষ্ণের চিত্র। কিন্তু পার্থক্য হলো যে, আমরা আপনার ছবির সঙ্গে কথা বলতে পারি না। এই হলো তফাৎ।

সাংবাদিক — কিন্তু তথাপি কেউ তো তাঁর চিত্র অঙ্কন করার জন্য কৃষ্ণকে নিশ্চয়ই দর্শন করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ। যখন শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে প্রকট ছিলেন, অনেক লোক তাঁকে তখন দর্শন করেছেন। সেই সময় থেকে কৃষ্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের বহু মন্দির রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত অনুরূপ রূপে তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন এবং ভক্তগণ তাঁর মূর্তি গঠন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপগুলি প্রত্যহ অর্চিত হয়। সহস্র সহস্র শ্রীকৃষ্ণের মন্দির রয়েছে।

সাংবাদিক — কিন্তু কেউ কি সত্যই কৃষ্ণকে দর্শন করেছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ, হ্যাঁ — ঠিক যেমন আপনার পিতা আপনার পিতামহকে দেখেছেন। আপনি হয়ত তাঁকে নাও

দেখতে পারেন, কিন্তু আপনার পিতা তার বর্ণনা দিয়েছেন— 'আমার পিতা এইরকম ছিলেন' এতে অসুবিধা কোথায়?

ভক্ত — উনি জিজ্ঞাসা করছেন কেউ বর্তমানে কৃষ্ণকে দর্শন করেছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ — কিভাবে বর্তমানে কেউ তাঁকে দর্শন করতে পারেন? গুরু পরম্পরার মাধ্যমেই তাঁকে দর্শন করা সম্ভব। আপনি আপনার পিতামহকে দেখেননি, সুতরাং কিভাবে আপনি জানবেন তিনি কেমন ছিলেন?

সাংবাদিক — আপনার পিতামাতা আপনাকে বলবেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বর্তমান। কিন্তু তাঁকে দর্শন করার জন্য আপনাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রে সেটি বর্ণিত আছে। সেই সকল সাধু ব্যক্তি যারা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমময় ভাবাবেশে অবস্থান করেন তারা তাঁকে সর্বদা দিনের চব্বিশ ঘন্টাই দর্শন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ। সেইজন্য ভগবৎতত্ত্ববেত্তাদের কাছ থেকে পরম্পরা ধারার মাধ্যমে আপনাকে ভগবৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হতে হবে।

সাংবাদিক — কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান। সুতরাং বর্তমানেও তিনি বিদ্যমান।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য অবস্থান করেন। রাত্রিতে সূর্য বর্তমান কিন্তু আপনার তা দর্শন করার জন্য চক্ষু নাই। তার অর্থ এই নয় যে, সূর্য বর্তমান নেই। এটি আপনার ব্যর্থতা—আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।

সাংবাদিক — সেক্ষেত্রে আমাদের দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন?

শ্রীল প্রভুপাদ — আপনার যোগ্যতার প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বর্তমান। কিন্তু তাঁকে দর্শন করার জন্য আপনাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রে সেটি বর্ণিত আছে। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি। সেই সকল সাধু ব্যক্তি যারা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমময় ভাবাবেশে অবস্থান করেন তারা তাঁকে সর্বদা দিনের চব্বিশ ঘন্টাই দর্শন করেন। এটি উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য নয়। যদি আপনি কাউকে ভালোবাসেন, আপনি তাকে সর্বদা দেখতে পাবেন। তাই নয় কি? আপনার ভালোবাসার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দিনের চব্বিশ ঘন্টাই প্রাপ্ত হবেন এবং তিনি আপনার সঙ্গে বাক্যবিনিময়ও করবেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত করতে হলে কৃষ্ণকে শ্রবণ করার যোগ্যতা আপনাকে অর্জন করতে হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই বিরাজমান।

আপনার নাম কীর্তনের মান উন্নয়নের রহস্য

শ্রীমৎ শচীনন্দন স্বামী

কীর্তন শব্দের মূল — কীর্ত, যার অর্থ মহিমাকীর্তন।

কীর্তনে কাকে এবং কিসের জন্য মহিমান্বিত করা হয়?

ভগবতে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর রয়েছে — কলের্দোষনিধে রাজন্, অস্তিহ্যেক মহানগুণ। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য ... এই যুগ বহু দোষে পরিপূর্ণ, কিন্তু একটি সহজ সদ্‌গুণ এখানে রয়েছে, তা হলো শুধুমাত্র নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে আপনি জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি লাভ করতে পারেন। কখনও কখনও গণেশ কীর্তন এবং শিব কীর্তন হয় ... কিন্তু ভাগবতে কথিত আছে যে নিশ্চিতরূপে ... এব ... কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন হওয়া উচিত।

কেন আমাদের কৃষ্ণের মহিমাকীর্তন করা উচিত?

শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, যেহেতু তিনি অতীব সুন্দর, তিনি তাঁর সৌন্দর্যের দ্বারা রচিত ফাঁদের মাধ্যমে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আবদ্ধ করেছেন। একজন কবি কৃষ্ণের সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, হে চক্ষু রক্ষক, হে মোর নয়ন রক্ষক, কেন তুমি যত্নশীল নও? আমি তোমাকে প্রথম শ্রেণী দিচ্ছি, কিন্তু তুমি তোমার কর্মে যত্নবান নও। তুমি কৃষ্ণের সুন্দর রূপকে আমার হৃদয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেছ। এখন সে আমার হৃদয়সহ সর্বস্ব হরণ করেছে। হে মোর নয়নরক্ষক, তুমি চৌরাগ্রগণ্য সুন্দর কৃষ্ণকে আমার হৃদয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেছ, এবং সে আমার সর্বস্ব হরণ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বীর্যের জন্যও মহিমাকীর্তন করা হয়। আমি সেই কথা আজ চিন্তা করছিলাম। আমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে অনেক দূর গিয়েছিলাম। মনুষ্য সভ্যতার থেকে দূরে। তখন আমি তাদের দেখলাম। অস্ত্রে সজ্জিত দশজনের একটি দল আমার দিকে এগিয়ে এল। তারা কাছে এল। তাদের অস্ত্র আমাকে দেখাল। তাদের তীক্ষ্ণ দাঁত। তারা আমার সামনে আক্রমণাত্মক চিৎকার করল। দশটি শক্তিশালী গ্রাম্য কুকুর তাদের দাঁত নিয়ে চিৎকার করছিল। আমি খুব সাহসী নই, সুতরাং আমি উচ্চৈস্বরে নৃসিংহ মন্ত্র গাইতে লাগলাম ... এবং হঠাৎ কুকুরগুলি চলে গেল ... তারা দৌড়ে পালিয়ে গেল। কৃষ্ণ অত্যন্ত সাহসী। হ্যাঁ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। যারা তাঁর শরণাগত তারা সর্বদা তাঁর কাছে সাহস প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সৌন্দর্য, বীর্য, জ্ঞানের জন্য মহিমান্বিত করা হয় এবং যে কোন কর্মের চূড়ান্ত রূপ দিতে তিনি সক্ষম। কৃষ্ণের মতো সুন্দর কেউ নেই, তাঁর মতো বীর্যবান কেউ নেই, তাঁর মতো জ্ঞানী কেউ নেই এবং কেউ তাঁর মতো আশ্চর্য কর্ম করতে পারেন না।

কিভাবে আপনি কীর্তন করেন?

আপনার হাতে যন্ত্র নিয়ে কীর্তনের সঙ্গে আপনি নৃত্য করছেন। এক সময় আপনার হস্ত উত্তোলন করা উচিত ... এবং যখন সবকিছু করা হলো আপনি আপনার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণতি নিবেদন করুন। কথিত আছে ... জীব গোস্বামী বলেন, এইরূপে কীর্তনের মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহকে মহিমান্বিত করা হয়। আমরা সবাই ম্যাগনিফাইং গ্লাস চিনি। ক্ষুদ্র বস্তুকে বিশালকায় দেখানো হয়। হতেও পারে আপনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বল্প চিন্তা করেন, আপনার কৃষ্ণের স্মৃতিও স্বল্প। কিন্তু কীর্তনের মাধ্যমে আপনি ভগবানের মহিমাকীর্তন করতে পারেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি ভগবানের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। পাঁচশ বছর আগে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা অত্যন্ত তীব্রভাবে সংকীর্তন আন্দোলনের সূচনা হয়। তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে কৃষ্ণের মহিমাকীর্তন, আনন্দ সংকীর্তনের সূচনা করেন। সেখান থেকে বিস্তারলাভ করে প্রথমে তাঁর ভক্তদের দ্বারপ্রান্তে পৌছায়। বহু রাজনৈতিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও তা নবদ্বীপের পথে পথে বিস্তৃত হয়। পরবর্তীকাল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হয়।

আপনি দেখবেন ভারতের কিছু গ্রামে দূরদর্শন নেই, সেইজন্য প্রতি সন্ধ্যায় তারা কীর্তন করেন। অতঃপর পূর্ণতা লাভ করে এবং যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ পুরীতে বার্ষিক রথযাত্রায়

তীর্থভ্রমণে যান, তারা সংখ্যায় লক্ষ ছিলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কীর্তনে এমন শক্তি ছিল যে, ভগবানের দিব্যনামের কীর্তন অন্য ধর্মকেও প্লাবিত করে। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে খ্রীষ্টানরাও ভগবানের নাম কীর্তন শুরু করে। সুফীরাও আল্লা হো, আল্লা হো, আল্লা হো গাইতে শুরু করে। প্রত্যেক ধর্মেই কীর্তনের কিছু আঙ্গিকের উদ্ভব হয় যা ভগবান স্বয়ং এই পৃথিবীতে আনয়ন করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনে একটি অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গের ভাব ছিল।

অন্তরঙ্গ ভাব যা সঠিকভাবে কীর্তন করার সময় আপনাকে গ্রহণ করতে হবে সেটি এমন একটি ভাব যা কীর্তনকে সমৃদ্ধ করে। ভক্ত পৃথিবীতে তার সকল কৃতিত্ব সত্ত্বেও নিজেকে তুচ্ছ বলে মনে করেন। তিনি ভগবানের থেকে বিচ্ছেদ অনুভব করেন। তার এই বিরহানুভূতি এত তীব্র যে, তিনি এই বিচ্ছেদকে অতিক্রম করে পুনরায় ভগবানের চরণকমলে তাঁর স্থান ফিরে পেতে চান।

এই দুই ভাব ঃ দৈন্যতা এবং বিরহ মহাপ্রভুর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। 'তৃণাদপি সুনীচেন' ... এবং অন্যটি 'অয়ি নন্দতনুজ'। এই দুটি ভাব গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কীর্তনের অন্তবর্তী আকারটি গঠন করে। কিন্তু অপর একটি বহিরঙ্গ রূপও রয়েছে যা দর্শনযোগ্য। পুলক, অশ্রু স্তম্ভন, ভগ্ন কণ্ঠস্বর। এগুলি কীর্তনের ভাবের লক্ষণ যেগুলি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন আপনারা জানেন যে, যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন করতেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হতেন যেমন মধুপূর্ণ একটি গ্লাস খোলায় মাছিরা জমায়েত হয়। একদা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক মুসলমান রাজার রাজধানীর কাছে কীর্তন করেছিলেন। সেই সময় প্রকাশ্যে রাজপথে হিন্দুধর্মের লোক সমাবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি এখনও আপনি দুবাইতে গেলে দেখবেন আরবী ভাষায় লেখা আছে, কোন মুসলমান অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে কঠিন শাস্তি লাভ করবে। কিন্তু মহাপ্রভুর সাথে যারা এসেছিলেন তারা এগুলি উপেক্ষা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীবাস ঠাকুরের মুসলমান দরজি উচ্চৈস্বরে চীৎকার করতে করতে নৃত্য করতে শুরু করলেন, 'আমি দেখেছি, আমি দেখেছি, আল্লা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে এসেছেন' এবং যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাজাগণের রাজধানীতে কীর্তন করেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন সেই কীর্তনে যোগদান করেছেন। রাজা গুপ্তচরদের পাঠিয়েছেন কি ঘটছে তা তদন্ত করার জন্য এবং গুপ্তচররাও কীর্তন করতে করতে ফিরেছেন! উত্তম ... হরে কৃষ্ণ! হা হা হা ... রাজা উপলব্ধি করলেন তিনি নিশ্চয়ই ভগবান! কারণ আমি আমার রাজ্যে যা কিছু করতে চাই তার জন্য আমাকে তাদেরকে বেতন দিতে হয়, কিন্তু মহাপ্রভু তাদের সর্বাধিক বিপজ্জনক কাজ করতে উৎসাহিত করছেন এবং তার জন্য তিনি তাদের একটি চাপাটিও দিচ্ছেন না। আমি রাজা। আমাকে আমার দাসদের বেতন দিতে হয়। না হলে তারা আমার জন্য একটি কাজও করবে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশ্য রাজপথে তাদের দিব্যনাম সংকীর্তন করার মতো বিপজ্জনক কাজ করাচ্ছেন।

মহাপ্রভু কৃষ্ণের নিকট পৌছানোর জন্য কীর্তনকে সর্বাধিক কার্যকরী পথ বলে বর্ণনা করেছেন। 'মাধ্যম' কথার বাংলা শব্দ 'উপায়'। এর অর্থ এমন কিছু যার দ্বারা আপাত দৃষ্টিতে দুষ্প্রাপ্যকেও প্রাপ্ত করা যায়।

মহাপ্রভু কৃষ্ণের নিকট পৌছানোর জন্য কীর্তনকে সর্বাধিক কার্যকরী পথ বলে বর্ণনা করেছেন। 'মাধ্যম' কথার বাংলা শব্দ 'উপায়'। এর অর্থ এমন কিছু যার দ্বারা আপাত দৃষ্টিতে দুষ্প্রাপ্যকেও প্রাপ্ত করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছানো ... অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। মহান ঋষি এবং সাধুগণ বহু বছরের তপস্যায় এমন কি আজীবন তপস্যাতেও ব্যর্থ হন। কিন্তু মহাপ্রভু বলছেন, কীর্তনের মাধ্যমে আপনার পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি, পরমগতিও আপনি লাভ করতে পারেন। আপনাদের উপায়ের একটি উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈদিক শাস্ত্র সমূহতে ধনুর্বিদ্যার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। একটি ধনুকের দ্বারা একটি কাষ্ঠখণ্ড বা একটি লৌহখণ্ড ৫০০ মিটার পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে। সাধারণত লোহা বা কাঠ উড়তে পারে না। কিন্তু উপায় দ্বারা, শক্তিশালী মাধ্যম দ্বারা এগুলি উড়ে গন্তব্যে পৌছতে পারে। বেদমন্ত্রে এই বর্ণনা রয়েছে। কথিত আছে বেদমন্ত্র ধনুক স্বরূপ, শুদ্ধ জীবাত্মা তীরস্বরূপ এবং গন্তব্যস্থল পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্দে পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্লোক ৪২। আমার প্রথম দিব্যনাম সংকীর্তনে, রাশিয়ায় আমি এই কীর্তনরূপ তীরের কথা বলেছিলাম। আমাদের কিছু ভক্ত মনোবিদ্যা থেকে ৩০০০ সেখানে ছিলেন, আমি স্মরণ করতে পারছি ... আমরা সেই সময় ভগবান সকাশে জীবাত্মাকে উপস্থিত করায় দিব্য নামের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। কিন্তু আপনারা যদি সম্যক কীর্তন বা শুদ্ধ কীর্তন করেন তবেই এটি কার্যকরী হবে। যদি কীর্তন করার কৌশল সম্বন্ধে আপনারা অজ্ঞ হন তাহলে আপনারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে পৌছতে অক্ষম হবেন। কিন্তু কীর্তন সম্বন্ধে বেশী বলে ক্লান্তিকর করার থেকে

আমি ধনুর্বিদ্যার উদাহরণে ফিরে যেতে চাই। আপনারা কেউ কি কখনও ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করেছেন? এটি সহজ নয় ... না? লক্ষ্যে বিদ্ধ করা? আমি বাল্যকালে চেষ্টা করেছি এবং পরবর্তীকালে রবিনহুডের মতো ধনুক নিয়ে আমি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছি, কিন্তু আমি এত অলস ছিলাম যে আমি পারিনি। কিন্তু আমি স্মরণ করতে পারি ... আমি দুঘন্টা শিক্ষাগ্রহণ করেছিলাম ... এবং আমাকে বলা হয়েছিল যে, তোমাকে তোমার দেহের যথার্থ প্রয়োগ করতে হবে। যে ব্যক্তি আমার পূর্বে করেছিল সে প্রায় শ্রবণক্ষমতা হারাচ্ছিল যখন ধনুকের ছিলা বাজছিল। হ্যাঁ, আপনাকে জানতে হবে কিভাবে এই শক্তিশালী ধনুক কাজ করে। আপনাকে আপনার মন স্থির করতে জানতে হবে। কোনওভাবে আমি মনে করতে পারছি আমার শিক্ষক সর্বদা আমাকে বলতেন, 'তোমার মনকে লক্ষ্যে স্থির কর।' অতঃপর যখন আপনি অভ্যাস করবেন আপনি শক্তিশালী হবেন, আপনার দেহ সঠিক দিকে অগ্রসর হবে এবং আপনাকে আপনার ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। আমি স্মরণ করি, আমি করেছিলাম ... আমি আর পরে তা করতে পারিনি ... এটি ক্লান্তিকর। আমি স্মরণ করতে পারি ধনুকের ব্যবহার সহজ নয়। অনুরূপভাবে কীর্তনও সহজ নয় ... এটি একটি শিল্প। আপনাকে সঠিকভাবে করতে হবে।

আপনাকে আপনার দেহ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। সঠিকভাবে বসতে অথবা নৃত্য করতে হবে। অতঃপর মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। আপনার মন স্থির করতে হবে। অমনোযোগী হওয়া যাবে না।

প্রভুপাদ বলেছেন, আপনার কীর্তন মন দিয়ে শ্রবণ করুন, আপনাকে কৃষ্ণের কথা ভাবতে হবে, যাঁর নাম আপনি কীর্তন করছেন। হ্যাঁ, আপনাকে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে, একে বলা হয় কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ। আপনার মধ্যে সেই আর্তি আনতে হবে, হে কৃষ্ণ, আমি তোমার বিচ্ছেদ অনুভব করছি। যদি আপনি কৃষ্ণের কথা না ভেবে কীর্তন করেন, অধিকাংশ লোক যেমন করে, আমি শুধু কীর্তনের ছায়ামাত্র করছি। ছায়া কীর্তন। এটি আপনাকে পুষ্ট করবে না। যখন আপনি কোন কিছুর ছায়া গ্রহণ করেন, যেটি দৃশ্যত এক কিন্তু সেটি কখনোই আসলের কর্ম করবে না। আপনি আপনার বন্ধুর ছায়ার সাথে কথা বলতে পারেন না। আপনি কৃষ্ণভাবনামৃতের ছায়াতে আনন্দ পেতে পারেন না। যেমন আপনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের ছায়াতে আনন্দ পাবেন না। আপনাকে বিষয়ে পৌঁছানো শিখতে হবে। এর অর্থ আপনার দেহ, মন এবং হৃদয়কে কীর্তনে আনতে হবে। কৃষ্ণের জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে হবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে কথিত আছে যেমনভাবে শিশুপাখী বাসায় বসে মায়ের অপেক্ষা করে, অনুরূপভাবে হে প্রভু! আমরাও আপনার অপেক্ষায় আপনার দিব্যনাম কীর্তন করছি।

যেমন গোবৎস তার গোমাতার স্তন্যপান করে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, হে মোর কৃষ্ণ, আমরাও সেইরূপ আপনার অপেক্ষায় আছি।

এইরূপে হরে কৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তনের জন্য বহু সুন্দর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যখন আপনি ছায়া কীর্তন সমাপ্ত করতে চান, আমি সর্বদা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে একটি শ্লোক নির্দেশ করতে চাই।

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।।
(চৈ. চ. মধ্যলীলা ২২ অধ্যায় শ্লোক ৩৩)

কেউ যদি একবার অন্তত ঐকান্তিকভাবে বলেন, 'হে কৃষ্ণ, যদিও বহুকাল আমি এই জড় জগতে তোমাকে ভুলে ছিলাম, কিন্তু আজ আমি তোমার শরণাগত হচ্ছি। আমি তোমার হলাম, এখন তুমি আমাকে তোমার সেবায় নিযুক্ত কর।' শ্রীবৃন্দাবনের দিব্যধামে প্রবেশের নিমিত্ত হরিনাম কীর্তনের সময় আমাদের এই ভাব হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ১। সমুদ্র মন্থন কালে অমৃত উঠল। সেই অমৃত দেবতারা পান করে অমর হলেন। কিন্তু দেবপত্নীরা তো অমৃত পান করতে পারেন নি। তাদের গতি কি হবে?
— প্রেমানন্দ দাস, লতিবারী, আসাম

উত্তর ঃ বাস্তবিক মহাকালের অধীন সমস্ত জীব। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষুদ্রাণু কীট পর্যন্ত কেউই অমর নয়। সৃষ্টিতে সবার পরমায়ুর মেয়াদ রয়েছে। সেই মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সেই জীবন বিলুপ্ত হয়ে যায়। সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত পাওয়া গেল, সেই অমৃত খেয়ে বড় জোর অকালমৃত্যু রোধ করা সম্ভব। অর্থাৎ হঠাৎ অস্ত্রাঘাতে, কিংবা ধাক্কা খেয়ে, কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মরে যাবে না। দেবতাদের দেখা যায় তাঁরা অসুরদের আক্রমণে জর্জরিত। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে যাতে তাদের অকালমৃত্যু না ঘটে সেজন্যই অমৃত পান করেন। দেবপত্নীরা তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন না। তাই তাঁরা নাই বা পেলেন। তা ছাড়া অমৃত পান করতে গিয়ে ঘটনা স্থলে নানা হুটোপাটিতে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা এই চিন্তা করে কোনমতেই একটু অমৃত পান করেই সরে পড়তে হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে এও শোনা যায় যে, দেবতারা পত্নীদের জন্য অমৃত নিয়ে গিয়েছিলেন। অর্ধাঙ্গিনী বলে কথা। তাদেরকেও দিয়েছিলেন। এমনকি স্বর্গলোকে অমৃত গচ্ছিত রেখেছিলেন।

আবার এও সত্য যে, অমৃত পান করলেই ভালো গতি হবে, অন্যথায় খারাপ গতি হবে, সেরকমও নয়। বাস্তবিক শ্রীভগবানের কৃপা গ্রহণ করাটাই যথার্থ জীবন লাভ করা বোঝায়। দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত পান করে স্বর্গলোকে যতই সুখে থাকুক না কেন, দৈত্যরাজ বলী সেই অমৃতপান না করে সুতল লোকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সুখশান্তিতে ও আনন্দে বিরাজ করছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীবামনদেব বলী মহারাজের দারোয়ান হয়ে সুরক্ষা প্রদান করছেন। ইন্দ্রেরও সেরকম সৌভাগ্য নেই। কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হয়ে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে। যে ব্যক্তিরা প্রেমামৃত নিয়ে রয়েছে তারা চিরসুখী।

শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীরা গান করছেন — *তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্* । হে ভগবান, হে কৃষ্ণ, তোমার কথা-অমৃতই আমাদের দুঃখ-উত্তপ্ত প্রাণে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিখিয়েছেন কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপ্রসাদ নিয়েই জীবন যাপন করতে। কৃষ্ণনামামৃত, কৃষ্ণকথামৃত, কৃষ্ণঅধরামৃত, কৃষ্ণচরণামৃত তথা কৃষ্ণভক্তিরসামৃত গ্রহণ করেই সর্বকলুষমুক্ত হয়ে শাশ্বত সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করা যায়। সেটিই অমর হওয়ার যথার্থ পন্থা।

প্রশ্ন ২। আমাদের এলাকায় লোকদের মুখে দুইটি বুলি প্রায়ই শোনা যায়। এক, 'মনে মনে হরিনাম করো' এবং দুই, 'মন যা চায় তাই খাও।' এ কথার অর্থ কি?
— পলক রায়, পূর্ব মেদিনীপুর

উত্তর ঃ 'মন' বিষয়ে দুটি মনগড়া বুলি আমিষভোজী লোকেরাই সাধারণত পোষণ করে থাকে। কারণ, মানুষ সরল বা বোকা হতে চায় না, তারা ধূর্ত বা চালাক হতে চায়। রক্ত-মাংস-হাড়-পিত্ত হচ্ছে অমেধ্য বস্তু। সেগুলি অপবিত্র হলেও যেহেতু বর্ণসংকর জাতের প্রভাবে প্রভাবিত সমাজে আশ্রিত হবার ফলে অমেধ্য ভক্ষণে অভ্যস্ত হতে হয়েছে, তাই আমিষ রস আস্বাদন পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করতে মন চাইছে না। আবার সেই ব্যক্তিও কখনও কখনও এই উপলব্ধি করে যে, হরিনাম করা মঙ্গলকর ব্যাপার। আমাকে লোক অভক্ত, নাস্তিক, পাষণ্ড বলুক — এটা আমি কখনও চাই না। আমি যা কিছুই করি না কেন, লোক আমাকে ভালো বলুক, ধার্মিক বলুক, সৎ মানুষ বলুক — এটা আমি খুবই চাই। আমাকে হরিনাম করতে হবে, আবার আমিষও ছাড়তে হবে — এটা আমি মনে প্রাণে চাই না, বরং বিপরীত আচরণকে কৌশল করে ধর্ম বলে প্রচার করতে পারলেই কেল্লা ফতে। যা ইচ্ছা খুশিমতো ভূরিভোজ করবো এবং হরিনাম করার ল্যাটা চুকিয়ে দিয়ে বলবো যে, আমি সব সময়ই হরিনাম করি মনে মনে। ব্যস্, আমি কৌশলে ধার্মিক ব্যক্তি বলে গণ্য হবো।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

সত্যভামা

কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তিকে ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিমাপ করেছিলেন

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

সত্যভামা কৃষ্ণের একজন অনুরক্ত এবং চাহিদা সম্পন্ন ভার্যা ছিলেন। তার এমন এক ধারণা ছিল যে, তিনিই কৃষ্ণকে পরিচালনা করেন এবং কৃষ্ণ তাঁর অন্যান্য রানীদের তুলনায় তাকে বেশী ভালবাসেন। একদা নারদমুনি যখন দ্বারকাতে যান সত্যভামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তখন কথোপকথনের সময় নারদ মুনি বলেন যে, রুক্মিনীই কৃষ্ণের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি নন। সত্যভামা এই কথা সহ্য করতে পারলেন না এবং এটি প্রমাণ করার জন্য নারদমুনিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলেন।

নারদ তাঁর চতুর বাক্যের দ্বারা সত্যভামাকে তুলাভরম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রলুব্ধ করলেন। শর্ত এই হলো যে, তিনি যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হন তাহলে কৃষ্ণকে নারদের কাছে দান করতে হবে। আর যদি তিনি জয় লাভ করেন তাহলে এটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, তিনিই কৃষ্ণকে পরিচালনা করেন এবং কৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা তাকেই ভালবাসেন। সত্যভামা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে গ্রহণ করলেন কারন তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর সমস্ত সম্পদের ভার অবশ্যই তুলা যন্ত্রে কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক হবে। এই বার্তা মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ল। কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীরা এর বিরোধিতা করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ একজন বিনয়ী, নম্র পতির ন্যায় তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মসমর্পন করলেন। একটি বড় তুলা যন্ত্রের আয়োজন করা হলো এবং সকলে সেই স্থানে এই লীলা আস্বাদনের জন্য একত্রিত হলেন।

সত্যভামা তুলাদন্ডের একটি তুলাপাত্রে কৃষ্ণকে রাখলেন এবং অপর তুলা পাত্রটিতে অসীম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর রত্ন সম্ভার রাখতে লাগলেন। এটি ছিল সমগ্র বিশ্বের কাছে তাঁর প্রমাণ দেওয়ার এক সুযোগ যে, হতে পারে কৃষ্ণের

হাজারো মহিষী আছেন, লক্ষ লক্ষ ভক্ত আছেন কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ তাঁকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন এবং কৃষ্ণের জন্য তার ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কৃষ্ণ যে তুলা পাত্রে বসেছিলেন সেই তুলাপাত্র সত্যভামাকে আতঙ্কিত করে এক ইঞ্চিও উত্তোলিত হলো না।

তিনি নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা করতে লাগলেন যে, যদি তাঁর ধনসম্পদ কৃষ্ণ অপেক্ষা ভারে বেশী না হয় তাহলে তাকে কৃষ্ণকে হারাতে হবে। এই চিন্তা তার হাড় হিম করে দিল। তিনি তাঁর কোষাগার থেকে সমস্ত মনি মাণিক্য, মুক্তো, পান্না, চুনি সমস্ত নিয়ে এসে তা তুলা পাত্রে স্থাপন করলেন তথাপি তা কৃষ্ণের তুলনায় অপ্রতুল মনে হলো। তিনি তখন কৃষ্ণকে যাতে না হারাতে হয় মরিয়া হয়ে একমাত্র রুক্মিনী ছাড়া অন্যান্য সকল মহিষীদের অনুরোধ করলেন তাদের সমস্ত ধনরাশি তাকে দিতে। রুক্মিনীকে না বলার এক বিশেষ কারণ ছিল। কৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীরা ভীত ছিল যে, যদি কৃষ্ণ দাস হিসাবে নারদমুনির কাছে বিক্রীত হয়ে যায় তাহলে কৃষ্ণকে দ্বারকা ত্যাগ করতে হবে এবং চিরকালের জন্য কৃষ্ণ বিহীন হয়ে থাকতে হবে। এই ভেবে তারা তাদের সমস্ত রত্নরাশি তুলাপাত্রের মধ্যে জমা করতে লাগলেন সমগ্র নিখিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রত্নকে অতিক্রম করার জন্য। কিন্তু কৃষ্ণ যে তুলা পাত্রে উপবেশন করেছিলেন তা এক চুলও নাড়াচাড়া করল না। সত্যভামা গভীর শোকে দিশাহারা হয়ে গেলেন।

যদি আমরা কৃষ্ণের করুণা প্রাপ্ত করতে চাই তাহলে আমাদের হৃদয়কে নির্মল করতে কঠোর পরিশ্রমের সাথে ভগবানের দিব্যনাম জপ করতে হবে, চিত্তকে প্রেমভক্তি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে এবং তখনই আমরা রুক্মিনী মাতার ন্যায় আমাদের নিস্কাম প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত করতে পারবো।

এখন এই নিখিল বিশ্বসংসারে একমাত্র একজনই অবশিষ্ট রয়ে গেলেন যার কাছে তিনি মিনতি করতে পারেন। সমস্ত অহংকার এক পাশে সরিয়ে রেখে তিনি রুক্মিনীর নিকট সহায়তার জন্য মিনতি করলেন। রুক্মিনী সর্বদাই তাঁকে সহায়তা করার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর সম্পদ তুলা পাত্রে স্থাপনের জন্য আনয়ন করেননি। পক্ষান্তরে তিনি একটি তুলসীপত্র নিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করে সেটি তুলাপাত্রে স্থাপন করলেন। ফলস্বরূপ তুলাপাত্রটি এত ভারী হয়ে গেল যে তৎক্ষনাৎ সেটি নীচে এসে গেল এবং কৃষ্ণ যেটিতে উপবেশন করে ছিলেন সেই তুলাপাত্র ওপরে উঠে গেল। প্রকৃতপক্ষে যখন সমস্ত সম্পদ অপসারণ করা হলো তখন শুধুমাত্র একটি তুলসী পত্রের ওজনও কৃষ্ণ অপেক্ষা বেশী ছিল। এই লীলা জগতবাসীকে এই শিক্ষা দেয় যে প্রেম, ভক্তি, বিনয় সহযোগে কৃষ্ণকে নিবেদিত বস্তু জগত সংসারে যে কোন ঐশ্বর্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

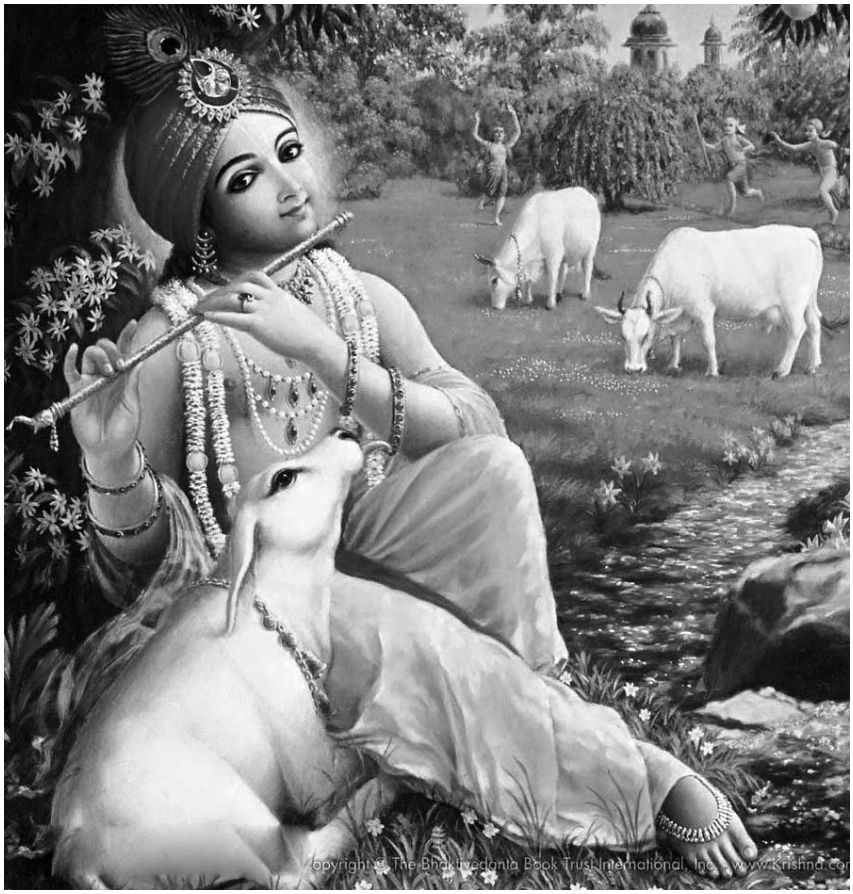
Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. www.krishna.com

ব্রহ্মসংহিতা (৫। ২৯) ব্রহ্মাজী বলছেন, 'লক্ষ্মী সহস্রশত সম্ভ্রমসেব্যমানম্। গোবিন্দমাদিপুরুষম্ তমহম্ ভজামি।।' আমি অনাদির আদি গোবিন্দ যাঁকে শত সহস্র লক্ষ্মী অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে সেবা করেন তাঁর ভজনা করি।। কৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্য বিদ্যমান। এই মহাবিশ্বে কোন ব্যক্তি যদি প্রতুল

ধনরাশি আহরণ করে তাহলেও তা লক্ষ্মীপতি কৃষ্ণের মাধ্যমেই আসে। সুতরাং কিভাবে আমরা জাগতিক বস্তুর বিনিময়ে কৃষ্ণকে ক্রয় করতে পারি। কৃষ্ণ এই সমগ্র বিশ্ব সংসারের মালিক। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্ গীতাতে (১০। ৮) ঘোষণা করেছেন, আমি জড় এবং চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। কৃষ্ণ শুধুমাত্র আমাদের প্রেমভক্তির আকাঙ্ক্ষী তাই প্রেম ও প্রীতি সহযোগে আমরা যা কিছুই কৃষ্ণকে অর্পণ করি তা তিনি পরমানন্দে গ্রহণ করেন।

এই কারণেই যখন দুর্যোধন কৃষ্ণকে তার প্রাসাদে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানান কৃষ্ণ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দুর্যোধন তার ঐশ্বর্যের অহংকার প্রদর্শন করে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত করার প্রয়াস করেছিলেন। তাই কৃষ্ণ এমনকি তার আমন্ত্রণও গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে তিনি আমন্ত্রণবিহীন অবস্থাতে বিদুরের গৃহে গমন করেছিলেন কারণ বিদুর এবং তার স্ত্রীর তাঁর প্রতি নিস্কাম প্রেমভক্তি তাঁকে তাদের বিনয়াবনত গৃহে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল। বিদুরের স্ত্রী কৃষ্ণ দর্শনে এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, কলার খোসা ছাড়িয়ে ভগবান কৃষ্ণকে কলা নিবেদনের পরিবর্তে কলা ছাড়িয়ে কলার খোসা নিবেদন করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে ভক্তের সেই প্রেমভক্তি সহযোগে নিবেদিত কলার খোসা আস্বাদন করতে থাকেন।

কৃষ্ণ ভগবদ্গীতা (৯। ২৬) এ আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করেন, 'যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিস্কাম ভক্ত ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পন করেন, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।' সুতরাং মূল নীতি হচ্ছে প্রেম ভক্তি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন এই জগত সংসারে লীলা বিলাস করছিলেন তখন তিনি শর্বরীর নিবেদিত অভুক্ত কুল পরমানন্দে গ্রহণ করেন কারণ তাতে পূর্ণ প্রেমভক্তি মিশ্রিত ছিল। সমস্ত বস্তুর মালিক কৃষ্ণ। তাই আমরা কৃষ্ণকে কি দিতে পারি?

এর অর্থ কি এই হয় যে, কৃষ্ণকে আমাদের দেওয়ার কিছুই নেই অথবা আমাদের শুধু সাধারণ বস্তু যেমন পাতা, ফুল ও জল কৃষ্ণকে নিবেদন করা উচিত। অবশ্যই নয়। তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং তপস্যা কর—হে কৌন্তেয়, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পন কর। (গীতা ৯। ২৭) সুতরাং আমরা যা কিছুই কৃষ্ণকে অর্পন করি না কেন তা শুধুমাত্র প্রেমভক্তি সহকারে অর্পন করতে হবে, শ্রদ্ধাহীন ভাবে নয়। আমরা ধনী তাই কৃষ্ণকে মূল্যবান বস্তু নিবেদন করলাম এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে কৃষ্ণ তা গ্রহণ করবেন। আবার কেউ গরীব এবং সে সাধারণ কিছু নিবেদন করছে এরও কোন নিশ্চয়তা নেই যে কৃষ্ণ তা গ্রহণ করবেন। তিনি শুধুমাত্র সেই নিবেদন গ্রহণ করেন যা প্রেম, ভক্তি এবং বিনম্রতায় পরিপূর্ণ।

তাই আমরা যারা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতে চাই আমাদের চেতনার ওপর পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি আমাদের চেতনা কলুষিত থাকে, অহমিকা ও ঔদ্ধত্যে পূর্ণ থাকে তাহলে কৃষ্ণকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারবো না। যদি আমরা কৃষ্ণের করুণা প্রাপ্ত করতে চাই তাহলে আমাদের হৃদয়কে নির্মল করতে কঠোর পরিশ্রমের সাথে ভগবানের দিব্যনাম জপ করতে হবে, চিত্তকে প্রেমভক্তি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে এবং তখনই আমরা রুক্মিনী মাতার ন্যায় আমাদের নিস্কাম প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত করতে পারবো।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

ডাল পনির

উপকরণ ঃ ছোলার ডাল ৫০০ গ্রাম। পনির ৩০০ গ্রাম। টম্যাটো বড় ১টি। নারকেল কোরা ১ কাপ। আদা বাটা ১ টেবিল চামচ। গোটা শুকনো লংকা ৪টি। তেজপাতা ৪টি। গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ। পাতিলেবু ১টি। ঘি আধ কাপ। লবণ পরিমাণ মতো। চিনি সামান্য। ধনেপাতা কুচি ১ কাপ। গোটা জিরা ২ চা-চামচ। হিং ১ চিমটি (ইচ্ছা হলে)।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ ছোলার ডাল সেদ্ধ করে নামিয়ে নিন। কড়াই ধুয়ে উনানে চাপান। কড়াই গরম হলে একটু ঘি রেখে বাকি ঘি ঢেলে দিন। পনীর টুকরো টুকরো করে ঘি কড়াইতে হালকা করে ভেজে একটা পাত্রে তুলে নিন।

এবার ওই ঘি কড়াইতে গোটা জিরা, শুকনো লংকা, তেজপাতা ফোড়ণ দিয়ে খুনতিতে নাড়িয়ে দিন। টম্যাটো কুচি করে দিয়ে দিন। একটু লবন দিন। দুই মিনিট নাড়ুন।

এবার আদা বাটা দিন। ধনেপাতা কুচি দিন। খুনতিতে নাড়া চাড়া করে সেদ্ধ করা ডাল তাতে ঢেলে দিন। একবার ডাল ফুটে উঠলে সামান্য লবণ, চিনি দিন। নারকেল কোরা, ভাজা পনির দিন। দুই মিনিট ফুটতে দিন।

তারপর আঁচ বন্ধ করে বাকি ঘি, গরম মশলা গুঁড়ো, পাতিলেবুর রস সেই কড়াইতে দিয়ে পাঁচ মিনিট মতো একটা ঢাকনা চাপা দিয়ে রাখুন।

গরম অন্ন বা পরোটার সঙ্গে এই ডাল পনির শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করুন।

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

দ্যা ইনস্পায়ার শো হচ্ছে জিমি ফেলনকে ইসকনের উত্তর

মাধব দাস ঃ দ্বিতীয় প্রজন্মের ভক্তদ্বারা নিবেদিত নুতন ইউ টিউব টক শো 'দ্যা ইনস্পায়ার শো' একটি বিজ্ঞ, গঠনাত্মক এবং উৎসাহব্যঞ্জক অধিক রাত্রির চ্যাট শো ফরমেট।

এই প্রদর্শনীতে, বলরাম নিত্যানন্দ দাস যিনি যুক্তরাজ্যের ভক্তিবেদান্ত ম্যানোরের আউটরিচ বিভাগটি পরিচালনা করেন তিনি বিভিন্ন ইসকন ভক্তদের সাক্ষাৎকার নেন এবং তাদের প্রতিকূলতার রকমগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য কি ছিল এবং কিভাবে সেই সমস্ত লক্ষ্য তাদের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে সাহায্য করেছে।

বলরাম আশা করেন যে, এই প্রদর্শনী শুধুমাত্র ভক্ত সম্প্রদায়কে একত্রিত করবে না, এটি সাধারণ মানুষকেও আকৃষ্ট করবে।

তিনি বলেন, 'আমি সেই চিত্র কল্পনা করতে চেষ্টা করছি যে, আজ রাত্রে কদম্ব কানন স্বামী মহারাজ যদি জিমি ফ্যালনের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যান তাহলে কি হবে। এবং আমি সম্ভাব্য কথোপকথনটিকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছি যা ভক্ত হোক বা না হোক প্রত্যেকের জন্য প্রাসঙ্গিক হবে। আশা করি প্রত্যেকেই এতে উপকৃত হবেন। মানুষ সুখী হতে চায় এবং আমরা এর উত্তর জানি — ভগবদ্গীতা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কিভাবে সুখী হওয়া যায় তার ব্যাকরণ।'

দ্যা ইনস্পায়ার শোয়ের নতুন পর্বগুলি প্রত্যেক রবিবারে উৎসাহ প্রদানের সঙ্গে বলরাম ইউ টিউব এবং ফেসবুকে পোষ্ট করেন।

নবাগত উৎসাহী ঘোষক রাধা শিভায়ার এই প্রদর্শনীটিকে নতুন, প্রাণবন্ত এবং গঠনমূলক বলে বর্ণনা করেন। বলরাম শুরুতে টিপিক্যাল টক্ শো ডেস্কে স্যুট এবং টাই পরে অবতীর্ণ হন। তার বিশেষ রসিকতা করার ক্ষমতা বিদ্যমান এবং অনেক কৌতূকও করেন।

বলরাম বলেন, 'আশা করি আমরা ভগবদ্গীতার দর্শন সহজভাবে কৌতূক, চাক্ষুষ এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষের জীবনে এর শিক্ষা প্রয়োগ কিভাবে করা যায় তা শেখাতে পেরেছি।'

ইসকন শিশু সুরক্ষা নির্দেশক যুক্তরাজ্যে ন্যায়াধীশ রূপে নিযুক্ত হলেন

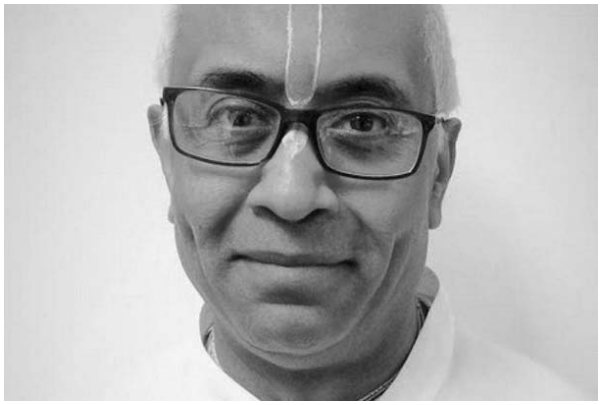

ইসকন নিউজ ঃ কমলেশ কৃষ্ণ দাস, ইসকন শিশু সুরক্ষা সংস্থার আন্তর্জাতিক নির্দেশক ব্রিটিশ বিচার ধারাতে জাস্টিস অব পিস ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত হলেন।

তিনি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সেবা প্রদান করবেন যেখানে

যুক্তরাজ্যের ৯৫ শতাংশ আইন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করা হয়। তিনি সরকারী ভাবে শ্রীল প্রভুপাদের ভগবদ্গীতা যথাযথর পয়লা এপ্রিলের উদযাপনের দিন শপথ গ্রহণ করেন এবং প্রাথমিকভাবে হার্টফোর্ড শায়ারে কর্মরত থাকবেন।

কমলেশ কৃষ্ণ পূর্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে কাজ করেন, ব্যাঙ্কিং ও ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে উচ্চপদে আসীন ছিলেন এবং পরবর্তীকালে বিগত কয়েক দশক ধরে যুক্তরাজ্যে ইসকন শিশু সুরক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। জুন ২০১৬ সালে ইসকন CPO নির্দেশক হিসাবে চম্পকলতা দাসীর স্থলাভিষিক্ত হন।

তার এই ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নব নিযুক্তির কারণ হচ্ছে ইসকনের শিশু সুরক্ষা বিভাগের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। এছাড়াও তিনি এবং তাঁর স্ত্রী গান্ধর্বিকা দাসী CPO গ্লোবাল সহকারি কেন্ট বিশ্ব বিদ্যালয়ে উন্নত শিশু সুরক্ষার ওপর মাষ্টার ডিগ্রি সমাপ্ত করতে চলেছেন।

কমলেশ কৃষ্ণ তার নতুন পদ শুরু করবেন একজন বরিষ্ঠ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আঠারো মাসের অন-জব ট্রেনিং সহকারে এছাড়াও নিয়মানুগ কেতাবি ক্লাসরুম ট্রেনিংও হবে। তারপর তিনি বিশেষ কোর্টে বসবেন যেখানে মামলা বিশেষ করে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত মামলাগুলি পরিচালনা করবেন।

সাইবেরীয়ার সমৃদ্ধ ভক্তজন
সমুদয় জপ রিট্রিটকে আলিঙ্গন করেছিল

মাধব দাস ঃ কৃষ্ণভাবনামৃতের মূল অভ্যাস ক্রিয়া হলো জপ। তাই বিগত সাত বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসর রাশিয়ার সাইবেরীয়াতে কেমোরোডো নামক স্থানের ভক্তরা স্থানীয় বৈষ্ণব এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষ জন সহযোগে বিশেষ জপ রিট্রিটে অংশগ্রহণ করে।

এই বছর কেমোরোডো জপ রিট্রিট ২৯শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত চলেছিল। প্রায় ১২০ জন ভক্ত এতে অংশগ্রহণ করেন এবং এক স্থানীয় নেতা লঘুহরি দাস এর জন্য এক সুন্দর রিসর্টের ব্যবস্থা করেন। পাঁচতারা ব্যবস্থাপনাসহ আরামদায়ক কক্ষ, জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য, লঘুদাসের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সুসম্পর্কের সুবাদে সকলেই গ্রহণযোগ্য খরচে রিসর্টে স্থান পায়।

পরবর্তী পাঁচ দিনের জন্য ভক্তরা প্রশস্ত মূল হলে একত্রিত হন ক্লাস শোনার জন্য যেখানে স্থানীয় জিবিসি ভক্তি চৈতন্য স্বামী, সুবল দাস এবং স্বরূপ দামোদর দাস এবং বৈষ্ণব প্রাণ দাস সকলে প্রবচন দেন। সম্মেলনটিতে ভগবান শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকম, জপে মনোযোগ এবং বৈষ্ণব সম্পর্কের গুরুত্বের ওপর আলোচনা করা হয়।

মূল দিনটিকে ৬৪ মালা জপের জন্য উৎসর্গ করা হয়। প্রত্যেকেই খুব সকালে সমবেত হন এবং ভগবানের দিব্যনাম করতে থাকেন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এবং গভীরভাবে নামজপে নিমগ্ন থাকেন।

ফুড ফর লাইফ লন্ডন তাদের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে 'ক্ষুধার বিরুদ্ধে পদযাত্রা' অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে

ইসকন সমাচার ঃ ফুড ফর লাইফ লন্ডন যারা বিগত ১৯৯৪ সাল থেকে গৃহহীনদের গরম নিরামিষ খাদ্য পরিবেশন করে চলেছে এবছর তাদের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এক ক্ষুধার বিরুদ্ধে পদযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

ফুড ফর লাইফ হচ্ছে ইসকন রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের এক প্রকল্প যারা প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৯০০ মানুষকে ভোজন সরবরাহ করে — শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত প্রায় দশলক্ষ মানুষকে প্রসাদ বিতরণ করেছে।

দশমাইল মধ্যে 'ক্ষুধার বিরুদ্ধে পদযাত্রা' অনুষ্ঠান শুরু হবে এবং ২৯শে জুন সোহো স্কোয়ারে শেষ হবে। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ 'কোন ইসকন মন্দিরের দশমাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন ক্ষুধার্ত মানুষ থাকবে না' এই নির্দেশকে প্রতিকী করে পদযাত্রা মন্দির প্রদক্ষিণ করবে।

অংশগ্রহণকারীরা সেন্ট্রাল লন্ডনের বিখ্যাত স্থান সমূহকে অতিক্রম করবে যেমন টাওয়ার ব্রিজ, দ্যা লন্ডন আই, সেন্টপলস ক্যাথিড্রাল, বাকিংহাম প্যালেস এবং হাইড পার্ক ইত্যাদি। পদযাত্রা কালে তারা কীর্তন করবে, প্রভুপাদ গ্রন্থ বিতরণ করবে এবং মিষ্ট প্রসাদম বিতরণ করবে এবং অনুদান গ্রহণ করবে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ১৫ পাউন্ড রেজিস্ট্রেশন চার্জ দেবে লক্ষ্য থাকবে আত্মীয়, পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট হতে ২৫০ পাউন্ড সংগ্রহ করা।

সংগৃহীত অর্থ একটি পরিবেশ বান্ধব পূর্ণ বৈদ্যুতিক খাদ্য সরবরাহ ভ্যান ক্রয় করার জন্য খরচ করা হবে যা ইওরোপে প্রথম পদক্ষেপ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

৯ম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর অনন্য ভক্ত শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ এই দুটি মার্গের অতীত। তাই তিনি নবম অধ্যায়ে আলোচনা করবেন কিভাবে অনন্য ভক্ত হওয়া যায়। ভগবদ্‌গীতায় প্রথম অধ্যায় হচ্ছে গ্রন্থটির প্রস্তাবনা স্বরূপ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের পারমার্থিক জ্ঞানকে গুহ্য বলা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় ভক্তিযোগের সঙ্গে যুক্ত এবং কৃষ্ণভাবনা বিকশিত করে তাই গুহ্যতর জ্ঞান। আর নবম অধ্যায়ে কেবল শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে তাই এই অধ্যায়টিকে বলা হয় গুহ্যতম — শ্রীল প্রভুপাদ প্রথম শ্লোকের তাৎপর্যে তা বিশ্লেষণ করেছেন। এই অধ্যায়ের বিভাজন —

১নং-৩নং — শ্রবণ (যোগ্যতা ও অযোগ্যতা)
৪নং-১০নং — ঐশ্বর্য জ্ঞান (শ্রীকৃষ্ণের সাথে জড় জগতের সম্বন্ধ)
১১নং-২৫নং — মূর্খরাই ভক্তিকে অবজ্ঞা করে
২৬নং-৩৪নং — কৃষ্ণভক্তির মহিমা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্য ভক্তের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন (১নং) তুমি নির্মৎসর বলে এই পরম বিজ্ঞান সমন্বিত সবচেয়ে গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করছি। ২নং শ্লোকের গুহ্যতম জ্ঞানের সাতটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। ৩নং শ্লোকে ভগবান বোঝাতে চাইলেন যারা অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তি তারা কখনই এই ভক্তিযোগ সাধন করে না এবং শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারে না।

২নং শ্লোকের ৭টি বৈশিষ্ট্যগুলি একটু ব্যাখ্যা করে দিলে আমাদের বুঝতে আরো সুবিধে হবে।

১) **রাজবিদ্যা** — সমস্ত মতবাদ ও দর্শনের সারস্বরূপ। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। কারণ এই জ্ঞান লাভ করার ফলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হতে পারে।

২) **রাজগুহ্যম্** — সমস্ত গোপনীয়তার রাজা। ভগবান নিজের সমস্ত রহস্য উন্মুক্ত করে এই তত্ত্ব বুঝিয়েছেন যে, সেই আমি সমস্ত জগতের কর্তা ও পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান তাই আমার প্রতি সর্বতোভাবে

শরণাগত হও। কারণ এই কথা অর্জুনের ন্যায় দোষদৃষ্টি রহিত পরম শ্রদ্ধাবান ভক্তের কাছেই বলা সম্ভব; সকলের কাছে নয়। তাই রাজগুহ্যম।

৩) **পবিত্রমিদমুত্তমম্** — পবিত্র এবং উত্তম। এই জ্ঞান এতটাই পবিত্র যদি আপনি শ্রদ্ধাপূর্বক উচ্চারণ করবেন এবং মনন করবেন এবং যদি সেই ভাবে আচরণ করবেন তা হলে সমস্ত পাপ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে এবং শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে পারবেন। জগতে যত উত্তম বস্তু তার মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই উত্তম বলা হয়েছে।

৪) **প্রত্যক্ষাবগমং** — প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্মউপলব্ধি। যেমন আপনি যখন খাবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন সরাসরিভাবে যে পেট ভরছে। আপনি তুষ্টি, পুষ্টি ও সন্তুষ্টি অনুভব করতে পারবেন। ঠিক তেমনি ভক্তি করলে আপনি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করবেন যে, আপনি সুখ অনুভব করছেন এবং পবিত্রতা অনুভব করছেন।

৫) **ধর্মম্** — ধর্মের যথার্থতা। এ সমস্ত ধর্মের পরম লক্ষ্য ভক্তিযোগ বা ভগবৎ সেবা।

৬) **সুসুখম্** — অত্যন্ত সুখসাধ্য। ভক্তিযোগ করলেই অনুভব করতে পারবেন।

৭) **অব্যয়ম্** — নিত্য - শাশ্বত

৪নং শ্লোকে ভগবান বলছেন অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলেছেন— সরকারের প্রধান যেমন স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন কিন্তু তার ক্ষমতা সব বিভাগেই অবস্থিত থাকে। অথবা আর একটা উদাহরণ দিই বোঝার সুবিধার জন্য, রাস্তার মাঝখানে একটা লাল ঝান্ডা পোঁতা আছে — আপনি ৮০ কিলোমিটার বেগে গেলেও ঐ পতাকা দেখলেই আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন, কেন?— সরকারের প্রতিনিধি লাল ঝান্ডা পুঁতেছে। যদিও সরকার স্বয়ং সেখানে উপস্থিত নেই — কিন্তু আবার আছে মানে তার সিম্বলের মাধ্যমে শক্তি কার্য করছে তাই দাঁড়িয়ে যাবেন।

৫নং শ্লোকে ভগবান তাঁর অচিন্ত্য ঐশ্বর্যের কথা ব্যক্ত করেছেন কারণ তারা যদিও আমার অচিন্ত্য শক্তিতে অবস্থান করে, কিন্তু তবুও পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমি তাদের থেকে ভিন্ন।

৬নং শ্লোকে 'যোগমৈশ্বরম্' বোঝানোর জন্য একটি উপমা ব্যবহার করেছেন — আকাশ ও বাতাস।

৭নং — ব্রহ্মার ১০০ বৎসর আয়ু শেষ হলে মৃত্যু হয়। সেটা বলা হয় কল্প, আর ১০০ বৎসর পরে ব্রহ্মার আয়ু শেষ হলে প্রলয় হয়। জীব ভগবানের দেহে অব্যক্ত রূপে প্রবেশ করে, আবার কল্পান্তে প্রকাশিত হয়।

৮নং ভগবানের ইচ্ছাতেই পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয় এবং অন্তকালে বিনষ্ট হয়।

৯নং — কিন্তু ভগবান এর দ্বারা প্রভাবিত হন না; তিনি অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন হাইকোর্টের জজ, তাঁর আদেশে কত লোকের প্রাণদন্ড হচ্ছে, কত লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কিন্তু জজসাহেব নিরপেক্ষ থাকেন।

১০নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'হে কৌন্তেয়' সম্বোধন করে বোঝাতে চাইছেন যদিও এই জড়জগতের সব কিছুর প্রতি নিরাসক্ত ও উদাসীন থাকি তবুও আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে কিছুই করতে পারে না। কারণ শক্তি তো শক্তিমানেরই অধীন। ঠিক যেমন রাজা সিংহাসনে আসীন হয়ে অভিভাবকত্ব না করলে মন্ত্রীগণ রাজ্য পরিচালনা করতে পারে না।

যেমন শ্রীকৃষ্ণ পিতা স্বরূপ আর জড়া প্রকৃতি মাতা স্বরূপ। পিতা যেমন মাতার গর্ভে বীজ প্রদান করে সন্তান উৎপন্ন করেন তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির গর্ভে জীবসমূহকে সঞ্চারিত করলে তারা তাদের পূর্বকৃত কর্মফল ও বাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও দেহ লাভ করে জগতে প্রকাশিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছিলেন, যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ফুল পরস্পর পৃথক, কিন্তু ফুলের সৌরভের সাথে যখন ঘ্রাণ শক্তির সংযোগ ঘটে, তখন ফুলের সৌরভ অনুভব করি, তেমনি জড়াপ্রকৃতি ও ভগবান পরস্পর পৃথক হলেও দৃষ্টির মাধ্যমে উভয়ের সংযোগ ঘটে।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই বা শক্তিতেই সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তা হলে কেন তাঁকে সকলে যথাযথ সম্মান দেন না তার উত্তর ১১নং শ্লোকে ভগবান দিচ্ছেন। 'আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।'

যেমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে শ্রীকৃষ্ণকে দলে নেওয়ার জন্য দুর্যোধন আগে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তাঁর মাথার কাছে বসেছিলেন। তারপর অর্জুনও গিয়েছিলেন

এবং কৃষ্ণের চরণের কাছে বসেছিলেন। ঘুম থেকে উঠেই অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ আগে দেখলেন। পরে দুর্যোধনকে দেখলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সব কিছু শোনার পর বললেন — আমি এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো না। তবে আমি যে দলে থাকব তার বিপরীত দলে আমার এক অক্ষৌহিনী নারায়ণী সৈন্য থাকবে। দুর্যোধন মনে মনে চিন্তা করছেন অর্জুন যদি এক অক্ষৌহিনী নারায়নী সৈন্য প্রথমে চেয়ে নেয় তা হলে সম্পূর্ণ আমার লোকসান হবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথম সুযোগ দান করলে অর্জুন বললেন, 'দাদার নির্দেশ, আমি আপনাকে চাই।' শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অর্জুন বুঝতে পারলেন কিন্তু দুর্যোধন বুঝতে পারলেন না। তাই ভক্ত মনোভাব না থাকলে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝা যাবে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, পূর্ব জন্মের পুণ্যকর্মের ফলে পন্ডিত হওয়া যায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে বোঝা যাবে না। শুধুমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই বোঝা যাবে।

১২নং শ্লোকে 'বিচেতসঃ' মানে মোহাচ্ছন্ন বা যাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত। তাদের আশা ব্যর্থ 'মোঘাশাঃ'। তাদের কর্ম নিষ্ফল 'মোঘকর্মাণঃ'। তাদের জ্ঞান বিফল 'মোঘজ্ঞানাঃ'। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে মুক্তির জন্য যদি কেউ অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন করে, অথবা জড় জাগতিক কল্যাণের জন্য কর্মকান্ড অনুশীলন করে অথবা জ্ঞানযোগ অনুশীলন করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপকে জড় বলে মনে করে, তবে তার সমস্ত আশাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ রূপকে যারা মেনে নেয় না, তারা কোন প্রকার সফলতাই লাভ করতে পারে না। কিন্তু যাঁরা (১৩নং) আমার সচ্চিদানন্দ রূপকে মেনে নেয় হে কুন্তীপুত্র, তাঁরাই মহাত্মা এবং তাঁরা অনন্য চিত্তে নিরন্তর আমার ভজনা করেন। সর্বদা দৃঢ়ব্রত ও যত্নশীল হয়ে (১৪নং) আমার মহিমা কীর্তন করে, আমাকে প্রণাম করে এবং ভক্তি সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করে। ভগবান ১৫নং শ্লোকে বোঝাতে চাইছেন আমার অনন্য ভক্ত ছাড়াও আর কিছু ভক্ত আছে।

(১) অহংগ্রহ উপাসনা — যারা নিজেকে ভগবান থেকে অভেদ ভেবে নিজের উপাসনা করে এদের বলা হয় অদ্বৈতবাদী। তারা মনে করে তাদের দেহটি তাদের স্বরূপ নয়। তারা মনে করে তাদের স্বরূপ হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। এই ভেবে তারা নিজেদের উপাসনা করে।

(২) প্রতীকোপাসক — এঁরা হলেন দেবোপাসক — তাঁরা তাঁদের পছন্দমতো যে কোন দেবতাকেই পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে তাঁর উপাসনা করেন।

(৩) এঁরা ভগবানের সর্বজনীন বিশ্বরূপকেই পরমতত্ত্ব বলে মনে করে তাঁর আরাধনা করে (বিশ্বতোমুখম্)।

১৬নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বোঝাতে চেয়েছেন — বৈদিক শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্মকান্ড মতে যজ্ঞানুষ্ঠান হয় তাও আমি। তাই এই শ্লোকে আটবার — 'অহম্' কথাটি ব্যবহার করেছেন। ১৭নং শ্লোকে ভগবান বোঝাতে চেয়েছেন সব কিছুই আমার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কারণ সবকিছুই আমার নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৮নং শ্লোকের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি শ্রীকৃষ্ণই সর্বকারনের পরম কারণ। ১৯নং শ্লোকেও তার কিছু প্রমাণ দিলেন।

পরমেশ্বর ভগবানের সেবা আর দেবদেবীর উপাসনা একই পর্যায়ে হতে পারে না; কারণ দেবোপাসনা হচ্ছে প্রাকৃত আর ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। সকল দেবদেবী ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ভগবানই সকলের প্রভু এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রূপে প্রকটিত —

২০নং-২৫নং দেবোপাসনার ফল বর্ণনা করেছেন। দেবোপাসকেরাও শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনা করে কিন্তু পরোক্ষভাবে। তারা বেদ অধ্যয়নের মাধ্যমে যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। পাপ মুক্ত হয়ে তারা বহুকাল স্বর্গে বাস করতে চায়। কিন্তু পুণ্যফল শেষ হলে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসে আর এই পথে বার বার পুনর্জন্ম হতে থাকে।

কিন্তু ভগবান জানিয়ে দিলেন (২২নং) আমার ভক্তদের অর্থাৎ যাঁরা আমাকে ছাড়া অন্য কারোর উপাসনা করে না— আমার একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁদের আমি সব কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু বহন করে নিয়ে আসি এবং সংরক্ষণ করে রাখি। একটি উদাহরণ দিলে আমরা সহজে বুঝতে পারব। যেমন মাতৃপরায়ণ ছোট শিশু সে তার মাকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না — তার যা কিছু প্রয়োজন তার মা তাকে দেয় কি না? — এমন কি যত পোশাকে সে বমি বা পায়খানা করে নষ্ট করে দেয় তার সব কিছু জিনিষ মা ধুয়ে গুছিয়ে রেখে দেয় কি না? যদি জাগতিক একজন মা তার ছেলে তাকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না বলে তার যা কিছু প্রয়োজন তা এনে দেয় এবং সংরক্ষণ করে রাখে, তা হলে ধ্রুব মহারাজের মা সুনীতি বলছেন শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুবকে যখন পাঁচ বৎসরের ধ্রুব বনে চলে যাচ্ছে তখন 'হে ধ্রুব কোটি মায়ের স্নেহ আছে ভগবানের হৃদয়ে, তুমি চিন্তা করো না — তিনি তোমাকে ঠিক সুরক্ষা প্রদান করবেন।' এই শ্লোকটি যখন একজন ভগবানের অনন্য ভক্ত অর্জুন আচার্য পড়লেন তখন ভাবলেন লাইনটির এই

শব্দটি ভুল আছে 'বহামি' 'আমি বহন করি' এটা ঠিক নয় 'করোমি' 'আমি করিয়ে নিই।' ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং বলরামকে সঙ্গে নিয়ে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে পিঠে তাঁর স্বামী মেরেছে তার দাগ দেখিয়ে দিলেন। পরে যখন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করে বাড়ী ফিরে এসেছেন সব কথা স্ত্রীর মুখ হতে শ্রবণ করে — ভগবানের এই কথাটির সত্যতা উপলব্ধি করতে পারলেন। তাই আমাদের ভগবানের কথার উপর একটু বিশ্বাস রাখতে হবে, তা হলে অমূল্য বস্তু লাভ করতে পারব। একটা প্রচারের কাহিনী বলি —

একসময় প্রচার করছি একজন বড় অফিসার ডেকে আমায় বললেন, 'সাধুবাবা, গীতার ৯/২২ নং শ্লোকটি পড়ুন— আপনাকে ঘুরে ঘুরে আর গীতা বিক্রি করতে হবে না।' আমি বললাম, খুব সুন্দর কথা — কিন্তু এই কথাটি উপলব্ধি করার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি — কে এই কথাটির (শ্লোকটির) সত্যতা প্রমাণ করবেন। অফিসারটি কথাটি শুনেই বললেন, 'বাঃ! খুব সুন্দর! ভিতরে আসুন' এবং কিছু বই ক্রয় করলেন।

২৩নং শ্লোকে 'অবিধিপূর্বকম্' মানে অবিধিপূর্বক। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ভগবান বলেছেন ৭। ২১ নং শ্লোকে, পরমাত্মা রূপে আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে যে ব্যক্তি যে দেবতার আরাধনা করতে চায় আমি তাকে সেই দেবতার প্রতি অচলা শ্রদ্ধা দান করি। আবার ভগবান বলছেন, যদিও তারা দেবতাদের আরাধনা করে কিন্তু পরোক্ষভাবে আমারই আরাধনা করে — তাহলে কিভাবে 'অবিধিপূর্বক' হয়। এছাড়াও কেউ বলতে পারে দেবদেবীরা যদি ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হন, তাহলে তাদের পূজা করার মাধ্যমেও একই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া উচিত, তাহলে কিভাবে দেবোপাসনা অবিধিপূর্বক হলো। এছাড়াও এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যদি দেবদেবীর উপসনা অবিধিপূর্বক হয় তাহলে কেন সর্বশক্তিমান ভগবান আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করে এই সুযোগ প্রদান করেন? এর উত্তর হচ্ছে — জীবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকত না। তিনি প্রতিটি জীবকে তাদেরই ইচ্ছানুরূপ আচরণ করার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দান করেন।

পরমেশ্বর ভগবানের সেবা আর দেবদেবীর উপাসনা একই পর্যায়ে হতে পারে না; কারণ দেবোপাসনা হচ্ছে প্রাকৃত আর ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। সকল দেবদেবী ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ভগবানই সকলের প্রভু এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রূপে প্রকটিত — এই তত্ত্ব না জেনে ঐসব দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক মনে করে সকামভাবে তাঁদের পূজা করাকে বলা হয় অবিধিপূর্বক।

যেমন ব্রজের গোপীগণ কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করে ছিলেন — শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার জন্য। ব্রজের

গোপীগণ কখনও ভাবেননি কাত্যায়নী দেবী হচ্ছেন সর্বোচ্চ পরম নিয়ন্তা। যদি কেউ মনে করে দেবদেবীরা হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ, ভগবানের কার্যের সহকারী হিসেবে কার্য করছেন — ভগবানকে লাভ করার জন্য নিষ্কামভাবে সেই সব দেবতাদের শাস্ত্রবিধিসহ শ্রদ্ধা পূর্বক পূজা করা হয় তাহলে ঐ দেবতাদের পূজার দ্বারা ভগবানের বিধিপূর্বক পূজা করা হবে। এর ফলও ভগবদ্‌প্রাপ্তি হবে। যেমন ব্রজের গোপীগণ কাত্যায়নীদেবীর কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন।

২৪নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা হচ্ছি আমি, কারণ আমি হচ্ছি পরম প্রভু।' এই সত্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে সাময়িক লাভের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করে। তাই তারা সংসার সমুদ্রে পতিত হয়।

এই ২৫নং শ্লোকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ — যে কোন রূপের আরাধনা করলে বা যে কোন পন্থা অনুসরণ করলে একই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় — এই যুক্তি সুন্দরভাবে খন্ডন করা হয়েছে এই শ্লোকে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনি মৃত্যুর পর কোথায় যাবেন এবং তার কি গতি এটাও সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এই শ্লোকে।

যারা দেবতার উপাসক তারা দেবলোক প্রাপ্ত হন। যেমন, কর্ণ সূর্যদেবের উপাসক ছিলেন যখন অর্জুন তাকে বাণের দ্বারা শির কেটে ছিলেন তখন তার শরীর থেকে এক জ্যোতি বার হয়ে সোজা উপর দিকে চলে গিয়ে সূর্যলোকে বিলীন হয়ে গেল। তারপর যারা পিতৃগণের উপাসক মানে পিতৃগণের জন্য যথাবিধি শ্রাদ্ধ, তর্পন করা, তাঁদের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করানো, হোম করা, জপ করা বা পূজা পাঠ করা বা তাঁদের জন্য শাস্ত্র গ্রন্থ দান করা ইত্যাদি হলো 'পিতৃব্রতাঃ'। মৃত্যুর পর পিতৃলোকে যাবেন এবং পিতৃগণের মতো শরীর লাভ করে তাঁদের ন্যায় বহু বৎসর ভোগ করবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ আছে জম্বুদ্বীপ বাসী মহারাজ আগ্নিধ্র পিতৃলোকে গিয়েছিলেন।

ভূত-প্রেত আদির উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যারা সচ্চিদানন্দময় আমার আরাধনা করেন, তারা নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করেন।'

অন্যান্য উপাসকগণ পুণ্য শেষ হলে আবার এই দুঃখপূর্ণ জড় জগতে ফিরে আসেন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ এই জড় জগতে আর ফিরে আসেন না — তিনি ভগবানের নিত্যধাম লাভ করেন। এই ধাম লাভ করা কত সহজ ২৬নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন — শুধুমাত্র ভক্তি সহকারে ভগবানকে তুলসীপত্র, ফুল, ফল ও জল দিলেই হবে। ২৭ নং 'যৎ' পদের সঙ্গে করোসি, অশ্নাসি, জুহোসি, দদাসি, তপস্যসি এই পাঁচ ক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে কি বোঝাতে চাইছেন? এর মাধ্যমে ভগবান বোঝাতে চাইছেন — 'যৎ করোসি' যা কিছু শাস্ত্রিয় কর্ম কর, শরীর নির্বাহের জন্য যা কিছু ভোজনাদি, যৎ অশ্নাসি; পূজা ও হোম সম্বন্ধীয় 'যৎ জুহোষি' সেবা দান সম্পর্কীয় সমস্ত কর্ম 'যৎদদাসি' সংযম ও তপ সম্বন্ধীয় সব কর্ম 'যৎ তপস্যসি' (২৮নং) ভগবানের চিন্তায় মগ্ন নিস্কাম কর্মযোগীর ফল। (২৯নং) ভগবান সকলকে সমানভাবে ভালবাসেন কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক তাঁকে ভালবাসেন ভগবানও তাঁদের মধ্যে বাস করেন একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে, যেমন গুড়ের দাম এককিলো (৮০ টাকা) আশি টাকা দাম। কিন্তু কেউ যদি ২০ টাকা দেয় ২০০ গ্রাম পাবেন কেউ ৪০ টাকা দেন তাহলে ৫০০ গ্রাম গুড় পাবেন এটাই সমদর্শী। না হলে কেউ ২০ টাকা দিয়েছে ও কেউ ৮০ টাকা দিয়েছে— দুই জনকেই যদি এক কিলো দিই তাহলেই পক্ষপাতিত্ব, সমদর্শী হলাম না।

৩০ নং শ্লোক যদি কোনো অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও অনন্যভাবে ভগবানে ভক্তি করে তাকে সাধু বলে মনে করা উচিত, কারণ তাঁর দৃঢ় সংকল্পে তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত। হাইওয়ে গাড়ী চালানোর মতো — ভালো চালানো জানলেও অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে তার জন্য নিন্দা করা উচিত নয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, চাঁদের কলঙ্কের মতো মনে করতে হবে। এই প্রকার কলঙ্ক চন্দ্রের আলো বিকিরণের বাধা স্বরূপ হয় না। আর একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধে হবে — ফ্রিজে আমরা ভাল জিনিষ ভাল রাখার জন্য রাখি, কিন্তু ভগবান বলছেন একেবারে গলা পচা বস্তু যদি আমার ফ্রিজে রাখো অর্থাৎ আমার গীতার জ্ঞানকে আশ্রয় কর, তা হলে একবারে শুদ্ধ করে তুলবো অর্থাৎ সাধু করে তুলবো। ভগবান এই কথাটি সত্যতার জন্য ৩১নং শ্লোকে অর্জুনকে দিয়ে ঘোষণা করে দিলেন। আর ৩২ নং শ্লোকে ভগবান বললেন, এই জ্ঞান গ্রহণের সকলের অধিকার আছে। স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করলেও ৩৩নং আর পুণ্যবান ব্রাহ্মণ, ভক্ত ও রাজর্ষিদের আর কি কথা? অতএব তুমি এই অনিত্য দুঃখময় মর্ত্যলোক লাভ করে আমাকে ভজনা কর। ৩৪নং শ্লোকে ভগবান প্রথমে মন চাইলেন, তারপর বললেন আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

গোপাল পৃথিবীর পরিমাপ করেছিলেন

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গোপালের সর্বদাই অনুমতি ছিল। একদিন গোপাল দেখলেন রাজা মশাই খুব অবসাদগ্রস্ত এবং চিন্তান্বিত।

গোপাল রাজামশাইকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস করল কিন্তু কোন ফল হলো না

বহু হাস্যকৌতুকের পরও রাজামশাই দুঃখিত ছিলেন।

পুনঃ গোপাল রাজাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করাতে রাজা মশাই বিরক্ত হলেন।

হে রাজন্ বিশ্বাস করুন আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি

ঠিক আছে শোন, মুর্শিদাবাদের নবাব আমাকে কিছু অসম্ভব ব্যাপারে আদেশ করেছেন। তিনি আমাকে এমন একজনের খোঁজ করতে বলেছেন, যিনি পৃথিবীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপ করতে পারবেন। এটা কি কখনো সম্ভব? তুমি জান আমাকে তাঁর আদেশ পালন করতে হবে।

হে রাজন, আমি আপনার জন্য এটি করব।

এটি হাস্য কৌতুকের সময় নয়। তুমি কি জানো বিফল হলে তোমার কি হবে? আমি শাস্তি পাবো আর তোমার চাকরী যাবে

আপনি চিন্তিত হবেন না রাজন্, এর কোনটিই ঘটবে না। হে রাজন্, আমার জন্য শুধুমাত্র কিছু বস্তুর ব্যবস্থা করে দিন। আমি ২৫টি গরুর গাড়ী চাই, সমস্তই কাঁচা রেশম এবং শহুরে সুতো দ্বারা পূর্ণ থাকবে।

গোপাল শীঘ্রই সমস্ত বস্তু সঙ্গে নিয়ে নবাবের মহলে উপস্থিত হলেন।

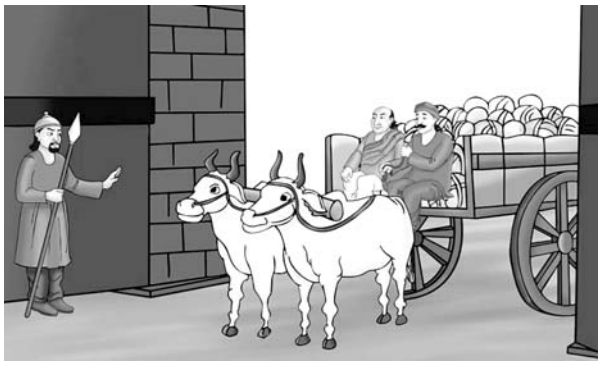

তিনি মহলে প্রবেশ করে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

তুমি কি কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে এসেছ?

হ্যাঁ মান্যবর, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এসেছি। অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাকে পরিমাপ দিয়ে দেব।

গোপাল নবাবকে গরুর গাড়ীর নিকট নিয়ে গেলেন।

প্রথম চৌদ্দটি গরুর গাড়ীর সুতোর মাপ হচ্ছে পৃথিবীর দৈর্ঘ্য এবং অবশিষ্ট গরুর গাড়ীর সুতোর মাপ হচ্ছে পৃথিবীর প্রস্থ।

কিন্তু যদি এটি সঠিক না হয়?

অবশ্যই সঠিক হবে, আর বিশ্বাস না হলে আপনি নিজে পরীক্ষা করে দেখে নিন মান্যবর।

নবাব অনুধাবন করতে পারলেন যে, তিনি চাতুর্যে পরাস্ত হয়েছেন। তিনি রাজাকে এক অসম্ভব কার্য দিয়েছিলেন এবং গোপাল প্রত্যুত্তরে এক অসম্ভব সমাধান দিয়েছেন। তিনি বাক্‌হীন হয়ে গেলেন। এবং গোপালকে পুরস্কৃত করলেন।

যাও এই লোকটিকে শত স্বর্ণমুদ্রা দাও।

আন্তরিকতা

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

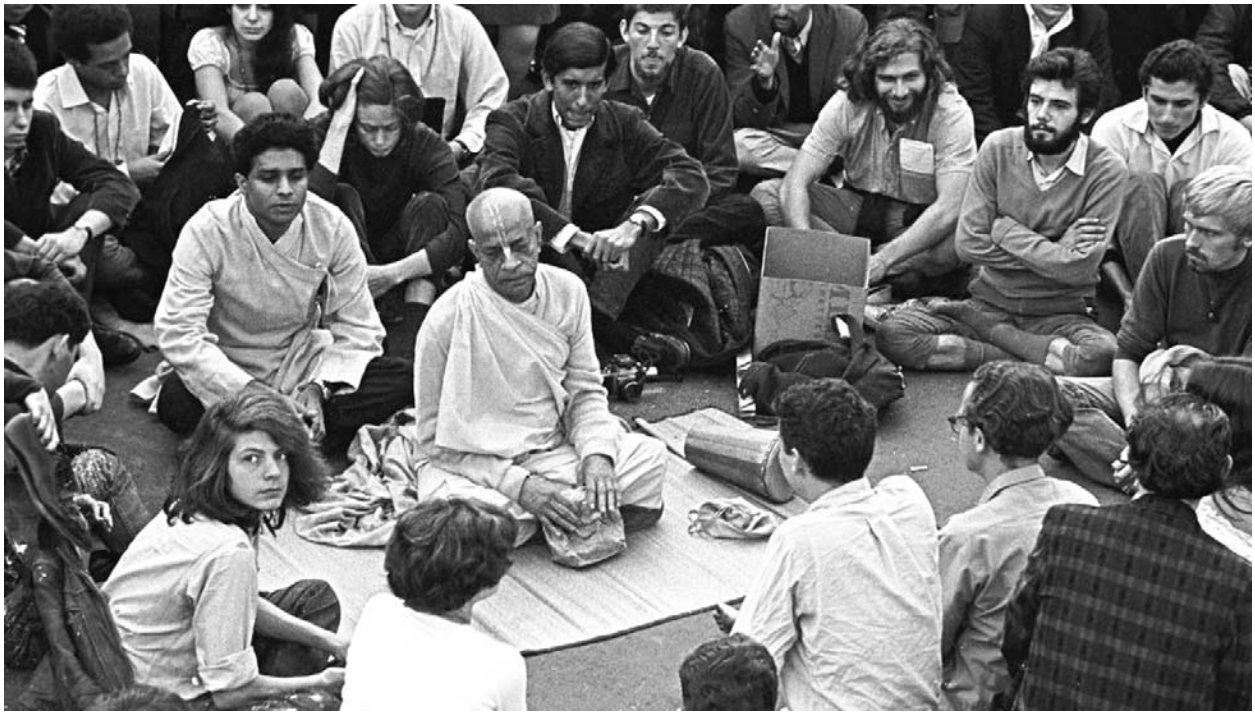

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।
(গীতা ৩। ৬)

যে ব্যক্তি পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ, রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে, সেই মূঢ় অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয়ে থাকে।

সোজা কথায়, বাইরে সাধু অন্তরে অসাধু — তাকেই বলা হয় ভণ্ড সাধু।

আন্তরিকতা শব্দটি অন্তর শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যিনি অন্তর থেকে সাধু, তিনিই প্রকৃত সাধু। শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন। তিনি ভক্তের শুধু ভাবটুকুই গ্রহণ করেন।

উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ ভেদে ভক্তদেরকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণী বিভাগ হচ্ছে আন্তরিকতার শ্রেণী বিভাগ। যাঁর অন্তরে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সবচেয়ে তীব্র, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ভক্ত। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ (গীতা ৪। ৩৯) শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করেন। অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি — শ্রদ্ধাহীন অজ্ঞ ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি অবশ্যই বিনষ্ট হবে। (গীতা ৪। ৪০)

একবার শ্রীপাদ হরিশৌরি প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য দেশে হরিভক্তি প্রচার করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের পূর্বেও অনেকেই এসেছিলেন। তারা কেন শ্রীল প্রভুপাদের মতো সাফল্যমণ্ডিত হন নি? হরিশৌরি প্রভু বললেন, আপনার কিছু গুরুভাই পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। তারাও তো আন্তরিক ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'তাঁরা কখনই আন্তরিক ছিলেন না।' ('They were never sincere')

ফল দেখেই বৃক্ষ চেনা যায়। শ্রীল প্রভুপাদের বিপুল সাফল্যই প্রমাণ করে যে, তাঁর আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম।

শ্রীল প্রভুপাদ সত্তর বছর বয়সে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে, মাত্র চল্লিশ টাকা সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় যাত্রা করেছিলেন। সে

সময় তাঁর না ছিল স্বাস্থ্যবল, না ছিল অর্থবল, না ছিল জনবল। শুধু আন্তরিক শ্রদ্ধাকে সম্বল করে তিনি তাঁর গুরুমুখ পদ্মবাক্য পালন করার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছিল গুরুবল, কৃপাবল।

কৃষ্ণভক্তির সাধনে আন্তরিকতার অভাবই সমস্ত ব্যর্থতার কারণ। শ্রীল প্রভুপাদের আন্তরিকতাই তাঁকে বিশ্বজয়ী জগদ্‌গুরুর পদ অলঙ্কৃত করার যোগ্যতা দান করেছিল।

আমরা ব্যক্তিগতভাবে কেউ কিছু করতে সক্ষম নই। অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহম্ ইতি মন্যতে (গীতা ৩। ২৭) — অহংকার বশত মূর্খ ব্যক্তি নিজেকে কর্তা বলে মনে করে।

এই প্রসঙ্গে পুরাণে উল্লেখিত চড়াই পাখির কাহিনীটি আমাদেরকে সুস্পষ্টরূপে শিক্ষা দেয় যে, আমরা কর্তা নই। সমুদ্রদেব চড়াই পাখির ডিম হরণ করে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চড়াই পাখি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলবে। সে তার ঠোঁটে করে অল্প অল্প জল বহন করে সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করল। তার সেই প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। তার এই আন্তরিকতা গরুড় পাখির হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করল। অবশেষে গরুড়দেব এসে সমুদ্রদেবকে ধমক দিতেই সে ভয় পেয়ে চড়াই পাখিকে তার ডিমগুলি ফেরত দেয়।

এই গল্পে চড়াই পাখি কর্তা নয়। কর্তা হচ্ছে আপাতত গরুড় পাখি। আবার গরুড়দেবও তার প্রবল শক্তি লাভ করেছেন শ্রীবিষ্ণুর কৃপায়। সুতরাং মূল কর্তা হচ্ছেন ভগবান।

তাহলে আমাদের ভূমিকা কি? আমাদের ভূমিকা হলো শুধু আন্তরিক প্রচেষ্টা — ঠিক এই চড়াই পাখিটির মতো। বাকি সব কাজ — সব অসম্ভবকে সম্ভব করবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ — কোনও না কোনও ভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে — শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্মরণ করলে দুঃসাধ্য কাজও সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। ভগবানকে ভুলে গেলে সহজ কাজও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

তাই আন্তরিকভাবে যখন আমরা প্রচেষ্টা করব, ভাবগ্রাহী জনার্দন তাঁর কৃপা বলে আমার পক্ষে সব অসাধ্য সাধন করবেন। অপর পক্ষে ভণ্ড সাধুরা চিরকালই ব্যর্থ হবে।

শুষ্ক বৈরাগীর লাগে আগুন কপালে।।

(গীতার গান ২। ৬০)

ব্রজধাম দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

কোকিলা বন — নন্দগ্রামের তিন মাইল উত্তর দিকে এবং যাবট গ্রাম থেকে আড়াই মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে কোকিলা বন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত আছে (৫। ১১৬১-১১৬৪)—

যাবটের পশ্চিমে এ বন মনোহর।
লক্ষ লক্ষ কোকিল কুহরে নিরন্তর।।
একদিন কৃষ্ণ এই বনেতে আসিয়া।
কোকিল-সদৃশ শব্দ করে হর্ষ হৈয়া।।
সকল কোকিল হৈতে শব্দ সুমধুর।
যে শুনে বারেক তার ধৈর্য যায় দূর।।

কোকিলের অদ্ভুত সুমধুর কুহু ধ্বনি শুনে জটীলা দেবী বিশাখাকে বললেন, এরকম কোকিলের ডাক কখনও শুনিনি। বিশাখা বললেন, যদি তুমি অনুমতি দাও তবে আমরা ওই কোকিলদেরকে দেখে আসি। জটীলা বললেন, যাও দেখে আসো। বিশাখা রাধারানীকে নিয়ে সেই বনে প্রবেশ করলেন। মধুর কুহু রবকারী কোকিলটি আসলে কে তা জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁরা নানা কৌতুক করতে লাগলেন।

কোকিলের শব্দে কৃষ্ণ মিলে রাধিকারে।
এহেতু কোকিলাবন কহয়ে ইহারে।।

এই বনে কোকিল বিহারীজী, রত্নকুণ্ড, মহাদেব মন্দির দর্শনীয়। কোকিলা বনে শনিদেবের মন্দির রয়েছে।

গরুড় পুরাণের এক কাহিনী শোনা যায় যে, শিশু কৃষ্ণকে দর্শন করবার আশায় বহু দেবদেবী আসতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পূতনা, তৃণাবর্ত, শকটাসুরের মহা উৎপাত, অর্জুন বৃক্ষ উৎপাটন প্রভৃতি ঘটনা, বিভিন্ন মায়াবী লোকের দৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনার কথা চিন্তা করে নন্দ মহারাজ যশোদারানীকে বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদের শিশুপুত্র কৃষ্ণকে যেন ঘরের বাইরে না আনা হয়। মা যশোদাও অনুভব করতেন কেউ না কেউ এসে আমার পুত্রের ক্ষতি করতে পারে।

একদিন প্রভু কৃষ্ণকে দর্শনের আশায় সূর্যপুত্র শনিদেব এলেন। কিন্তু দর্শনের কোনও সুযোগ পেলেন না। তখন শনিদেব ক্ষুব্ধ মনে এক নির্জন বনে এসে তপস্যা করতে লাগলেন। শনিদেবের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের রূপ ধারণ করে দর্শন দিয়ে বললেন, হে শনিদেব, আমি এই রূপে তোমাকে দর্শন দিলাম। তাই এই বনের নাম হবে কোকিলা বন। এই সুন্দর পবিত্র ধামে যত খল, দুষ্ট, পাপাচারী লোক আসবে তাদের বিনাশ করার দায়িত্ব তোমার।

বর্তমানে এখানে প্রচুর কাক দেখা যায়, কোকিল প্রায় দেখা যায় না। কোকিলা বন পরিক্রমা মার্গ রয়েছে। নির্জন বন মধ্যে ডাহুক, জলময়ূরী, সারস প্রভৃতি পাখী দেখতে পাওয়া যায়, ইতস্তত কোথাও নীলগাই, হরিণ দেখা যায়। বানর প্রচুর রয়েছে।

গিড়োহ — নন্দগ্রাম থেকে কৃষ্ণ-বলরাম প্রায়ই গোচারণে এসে এখানে সখাদের সঙ্গে গেন্দো খেলায় মত্ত থাকতেন।

বড় বৈঠান — কোকিলা বন থেকে চার কিমি উত্তর দিকে

এই স্থানে কৃষ্ণ-বলরাম খেলা অন্তে বসে বিশ্রাম করেছিলেন। বলরামের বৈঠক মন্দির আছে।

ছোট বৈঠান — বড় বৈঠান থেকে অর্ধ কিমি উত্তরে সখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খেলাধূলার পর এই গ্রামে বসে কেশ বিন্যাস করতেন। সখীরা ফুল তুলে এনে রাধিকার বেনীতে সাজিয়ে দিতেন। ব্রজবাসীদের আগ্রহে শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই দুই গ্রামে কিছুদিন ভজনানন্দে অবস্থান করেছিলেন।

দই গ্রাম — ছোট বৈঠান থেকে চার কিমি উত্তরে দই গ্রাম। গোপীদের কাছ থেকে এখানে কৃষ্ণ দধি লুণ্ঠন করেছিলেন। বল্লভ আচার্যের উপবেশন স্থান। ব্রজবাসীরা দধি মহোৎসব করে থাকেন।

কামর — দই গ্রামের পশ্চিম দিকের গ্রাম। গোচারণে এসে কৃষ্ণ ও রাধা নিরিবিলিতে বসেছিলেন। তারপর ঘরে ফিরবার কালে কামর বা কৃষ্ণের উত্তরীয় রাধার কাছে থেকে যায়। নন্দগ্রামে গৃহে এলে যশোদা মা বলেন, তোমার কামর কোথায়? সখারা কেউ কেউ বলে, ঘাস খেতে খেতে একটা গাই কামর খেয়ে নিয়েছে। কেউ বলে, স্নান করতে গিয়ে ওটা জলে ভেসে গেছে। সুবল বলে, তোমরা সবাই চোখ বন্ধ করো, আমি কামর এনে দিতে পারবো। শেষে দেখা গেল কৃষ্ণের কাঁধে কামর।

চরণ পাহাড়ী — ছোট বৈঠানের এক মাইল উত্তরে চরণ পাহাড়ী। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মধুর বংশীধ্বনি করতে থাকলে কৃষ্ণ-বলরামের চরণ তলায় শিলা গলিত হয়। কৃষ্ণের বাঁশী শুনে ছুটে আসা সুরভী গাভী, ঘোড়া, হাতি হরিণ প্রভৃতির পদচিহ্ন শিলার ওপরে প্রকাশিত হয়। পাষাণ দ্রবীভূত হলে কৃষ্ণ-বলরামের চরণ রজ যেখানে এসে জমা হয় সেই স্থানের নাম চরণগঙ্গা। এখানে স্নান করলে ধনসম্পদ লাভ হয়ে থাকে।

দই গ্রাম

বংশীধ্বনি শুনিয়া যে আইল এথায়।
তা সবার পদচিহ্ন দেখহ শিলায়।।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিহ্ন এ রহিল।
এই হেতু চরণপাহাড়ী নাম হইল।।
(ভক্তিরত্নাকর ৫। ১৩৯৭)

লালপুর — চরণ পাহাড়ীর পশ্চিমদিকে লালপুর। এই গ্রামে সখাসহ শ্রীকৃষ্ণলীলা আস্বাদন করবার জন্য দুর্বাসা মুনি এসেছিলেন। মুনি এখানে ভজন করেছেন।

কোটবন — চরণ পাহাড়ী থেকে চার মাইল উত্তর-পূর্বে কোটবন শ্রীকৃষ্ণের হোলি খেলাস্থলী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসে বিশ্রাম করেছিলেন।

কোশীকলা — কৃষ্ণ নন্দবাবাকে এখানে দ্বারকাপুরীর সমস্ত লীলা দর্শন করিয়েছিলেন। নন্দগ্রাম থেকে দশ কিমি ঈশাণে এই গ্রামে নন্দ মহারাজের কোষাগার ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈঠক আছে গোমতী কুণ্ড তটে। জি টি রোডের পশ্চিমধারে এই গ্রাম সম্পর্কে বরাহপুরাণে বলা হয়েছে —

কুশস্থলং চ তত্রৈব পুণ্যং পাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাতো নরো দেবি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি।।

এখানে পাপনাশক পুণ্যপ্রদ কুশস্থল নামক তীর্থ রয়েছে। সেখানে স্নানে সত্যলোকে গতি হয়। সেখানে দেহত্যাগ করলে ভগবদ্‌ধামে প্রাপ্ত হয়।

ফালেন গ্রাম — কোশীকলা থেকে পাঁচ কিমি পূর্বদিকে এই গ্রামে সখীগণ মনের আনন্দে তালে তালে গান গেয়ে লাল নীল, হলুদ, সবুজ বিচিত্র রঙের ফাগ বা আবির রাধাকৃষ্ণের অঙ্গে ছড়িয়ে ছিলেন।

পেগ্রাম — ফালেন গ্রামের অগ্নি দিকে এখানে গোচারণে এসে গোপবালকেরা কৃষ্ণের সঙ্গে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জলের সন্ধান করছিল। এক গোপী দধিভাণ্ড নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। জলভাণ্ড মনে করে বালকেরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে হাত পাতলো। গোপী তার কলসী থেকে দধি দিতে লাগল। তারা যত খেতে থাকে সে তত দিতে থাকে। শেষ হয় না। বালকেরা অবাক হয়ে যায়। গোপীও সস্নেহে বলতে লাগল, আরও পিও, আরও পিও। সেই লীলাস্থলী পেগ্রাম।

শেষশায়ী — কোশীকলা থেকে জলনিকাশী খাল বরাবর উত্তরদিকে হসনপুরের পর শেষশায়ী গ্রাম। এই গ্রামের পূর্বভাগে একটি সরোবর আছে। কৃষ্ণ রাধিকাকে বলেন, 'ওটি ক্ষীরসাগর। আমার ক্ষীরসাগরে শায়িত নারায়ণের কথা মনে পড়ছে। লক্ষ্মীদেবী তাঁর পাদপদ্ম সেবা করেন।' রাধা

শেষশায়ী

বললেন, জলের ওপরে কিভাবে নারায়ণ শুয়ে থাকেন, আর লক্ষ্মীদেবীই বা কিভাবে তাঁর সেবা করেন। কৃষ্ণ তখন অনন্তকে স্মরণ করা মাত্রই মনোহর ফণামণ্ডল বিস্তার করে সরোবর মধ্যে অনন্তদেব আবির্ভূত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে নারায়ণ বেশে অনন্তদেবের কোলে শয়ন করে রাধিকাকে আহ্বান করলেন। শ্রীরাধিকা সখীদের বললেন, উনি তো নারায়ণ! শ্রীকৃষ্ণ তখন নারায়ণরূপ সংবরণ করে নিজ মুরলীধর রূপ প্রকাশ করলেন। এভাবে ভাসতে ভাসতে সরোবরের তীরে এলে ললিতার প্রেরণায় রাধারানী প্রাণকান্তের চরণপ্রান্তে উপবেশন করে মৃদুমন্দভাবে প্রভুর পদমর্দন করতে লাগলেন। সরোবরের তীরে শেষশায়ী মন্দির। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে প্রেমোন্মত্তভাবে শেষশায়ী মূর্তি দর্শন করতে এলে ভাগ্যবান ব্রজবাসীরা বলেছিলেন, ঐ সন্ন্যাসীই আমাদের শেষশায়ী ভগবান।

নন্দনবন — শেষশায়ী থেকে দেড় কিমি দূরে নন্দনবন অবস্থিত। এখানে শ্রীনন্দমহারাজ ভজনানন্দে মগ্ন থাকতেন। তাঁর নাম অনুসারে নন্দনবন। মহাত্মাদের কথা, এই স্থান দর্শনে হৃদয় সুশীতল হয়ে যায়।

উঝানী — কোশীকলা থেকে শেরগড় রোডে পেগ্রাম থেকে ঈশাণে হুসেনী গ্রামের পর উঝানী। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে যমুনার জল উজান বয়েছিল অর্থাৎ জল উপছে পড়েছিল। তাই নাম উঝানী। এখানে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষকে গ্রামবাসীরা বলরামের সখা বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

শেরগড় — এখানে গোচারণে এসে কৃষ্ণ-বলরাম সখাদের সাথে ময়ূর নৃত্য, লাঠি খেলা প্রভৃতি খেলা করতে থাকলে স্থানটি খেলনবন নামে পরিচিত হয়।

দেখহ খেলনবন — এথা দুই ভাই।
সখা সহ খেলে — ভোজনের চেষ্টা নাই।।
মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ-বলরাম।
এ খেলনবনের শ্রীখেলাতীর্থ নাম।।

রন্ধেরা — শেরগড় থেকে পাঁচ কিমি নৈঋতে রন্ধেরা। এই গ্রামে তৃষ্ণার্ত শ্রীকৃষ্ণ জলপূর্ণ কলসীযুক্ত গোপীদের দেখে বলেন, হে রাধে, হে রাধেরা আমাকে একটু জলপান করাও। গোপীরা প্রেমের সঙ্গে জলপান করিয়ে ছিলেন।

রামঘাট — শেরগড় থেকে দুই মাইল পূর্ব দিকে যমুনা তীরে শ্রীবলরাম নিজ প্রেয়সী গোপীদের সঙ্গে দুই মাস ব্যাপী এখানে বিবিধ রাসলীলা করেছিলেন। জলক্রীড়া নিমিত্ত বলরাম যমুনাকে আহ্বান করলে যমুনা নিকটে না আসায় অতি ক্রোধে তিনি লাঙ্গল তুলে যমুনাকে আনতে উদ্যত হলে যমুনাদেবী দ্রুত জলস্রোত বইয়ে দিয়ে তাঁর কাছে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তখন বলরাম প্রসন্ন হন। নিত্যানন্দ প্রভু কিছুদিন এখানে অবস্থান করেছিলেন।

বিহারবন — শেরগড় থেকে চার কিমি দক্ষিণ-পূর্বে বিহারবন। ফুলবনের মধ্যে কেলিকদম্বের মূলে সসখী রাধাকৃষ্ণের মিলন স্থান।

অক্ষয়বট — রামঘাট থেকে পাঁচ কিমি দক্ষিণে অক্ষয় বট। এখানে বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। বৃক্ষের একটি শাখা যমুনার পূর্ব পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৃষ্ণ বলরাম ও সখারা সেই শাখায় চড়ে যমুনার এপার ওপার যাওয়া আসা খেলা করতেন। যমুনার মাঝখানে ঈষৎ নিচের দিকে নামানো শাখায় বসে কৃষ্ণ যমুনাজলে পা দোলাতেন। জলের মধ্যেকার মাছ কচ্ছপ এসে কৃষ্ণচরণে চুম্বন দিত। এই অক্ষয় বট স্থানে শ্রীবলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন। প্রলম্বাসুর বালকদের কাশ্রট খেলার সুযোগে বলরামকে কাঁধে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। বালক বলরাম তা বুঝতে পেরে তার মাথায় ঘুষি মারতে শুরু করলে অসুরটি বজ্রাহত পর্বতের মতো বিশাল আকার ধারণ করে পতিত হয়।

শেরগড়

তপোবন — অক্ষয় বট থেকে অর্ধ কিমি পূর্বদিকে যমুনাতীরে তপোবন। ষোলো হাজারেরও অধিক গোপকুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার বাসনায় অগ্রহায়ণ মাসব্যাপী ভোরবেলায় এখানে এসে যমুনাজলে স্নান সেরে বালুময়ী কাত্যায়নী প্রতিমা নির্মাণ করে সুগন্ধিমালা, ধূপ, দীপ, ফুল, ফল, তণ্ডুলাদি উপহার দিয়ে কাত্যায়নীর পূজা করেছিল। সেই কুমারীরা ভক্তিভরে করজোড়ে একসাথে একটি প্রার্থনা উচ্চারণ করত —

ষোলো হাজারেরও অধিক গোপকুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার বাসনায় অগ্রহায়ণ মাসব্যাপী ভোরবেলায় এখানে এসে যমুনাজলে স্নান সেরে বালুময়ী কাত্যায়নী প্রতিমা নির্মাণ করে সুগন্ধিমালা, ধূপ, দীপ, ফুল, ফল, তণ্ডুলাদি উপহার দিয়ে কাত্যায়নীর পূজা করেছিল।

কাত্যায়নি মহামায়ে ! মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।।

হে মহামায়ে মহাযোগীনি অধীশ্বরি কাত্যায়নী দেবি, তুমি নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতি করো, তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

এই সমস্ত তপস্বিনী গোপীরা ঠাণ্ডায় বহু দূরদূরান্ত থেকে এখানে এসে সূর্য উদয় হওয়ার আগেই পূজাপ্রার্থনাদি সেরে গৃহে পৌঁছে যেত। তাদের বয়স চার থেকে ছয় বছর মাত্র।

সিয়ারো — তপোবন থেকে তিন কিমি দক্ষিণে চীরঘাট। বর্তমান নাম সিয়ারো। যমুনার তীরে অতি প্রাচীন কেলিকদম্ব বৃক্ষ বিদ্যমান। কাছে কাত্যায়নী দেবীর মন্দির। রাত তিনটায় ঘাটে বস্ত্র রেখে চার পাঁচ বছরের বালিকাগণ যমুনা জলে স্নান করলে অলক্ষ্যে কৃষ্ণ বাঁশী বাদন মাধ্যমে বস্ত্রগুলি কদম্ব ডালের উপর এনেছিলেন। অবশেষে গোপবালিকাদের বস্ত্রগুলি ফেরত দিয়ে তাদের মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন।

তপোবনে কাত্যায়নী ব্রত

ভেগ্রাম — সিয়ারো বা চীরঘাট থেকে পাঁচ কিমি দক্ষিণে ভেগ্রাম। একাদশী ব্রতে রাত্রি জাগরণ করে শেষ রাতে নন্দ মহারাজ এখানে যমুনায় স্নান করেছিলেন। সেই সময়ে ঘাট থেকে বরুণদেবের অনুচরেরা তাকে বরুণালয়ে নিয়ে চলে যায়। নন্দ মহারাজকে দেখতে না পেয়ে সবাই ভয়ার্ত হয়েছিলেন। তারপর কৃষ্ণ-বলরাম বরুণালয়ে গিয়ে নন্দ বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এখান নন্দ বাবার মন্দির আছে। ঘাটের নাম নন্দ ঘাট। জীব গোস্বামী এই ঘাটে থেকে ষট্ সন্দর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জয়েতপুর — নন্দঘাটের দুই মাইল দক্ষিণে জয়েতপুর গ্রাম। বরুণালয় থেকে নন্দ বাবাকে নিয়ে এসে কৃষ্ণ এখানে উপস্থিত হলে এখান থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি সহ জয়ধ্বনি করেছিলেন।

হাজরা— জয়েতপুরের দেড় মাইল নৈঋতে হাজরা গ্রাম। এখানে ব্রহ্মা গোপবালক ও বাছুরদেরকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে হাজির করিয়েছিলেন।

বারারা — হাজরার এক মাইল নৈঋতে বারারা গ্রাম। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে বরাহ খেলা খেলতেন। এখান থেকে ব্রহ্মা বাছুরদের হরণ করেছিলেন।

বাজনা — বারারার এক মাইল নৈঋতে বাজনা গ্রাম। এর এক মাইল পশ্চিমের গ্রাম পশৌলীতে অঘাসুর বধ হলে দেবতারা এখানে পরমানন্দে বাদ্যধ্বনি করেছিলেন।

জনাই — অঘাসুর বধের পর শ্রীকৃষ্ণ এখানে সখাদের সঙ্গে ভোজন করেছিলেন এবং এখান থেকে ব্রহ্মা গোপবালকদের হরণ করেছিলেন।

শকরোয়া — জনাই গ্রামের আড়াই মাইল পূর্বদিকে এখানে দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণভজন করেছিলেন।

আঠাস — শকরোয়ার দেড় মাইল দক্ষিণে এখানে অষ্টাবক্র মুনির তপস্যা স্থল।

ছুনরাক — আঠাসের দেড় মাইল দক্ষিণে এই গ্রামে সৌভরি মুনির আশ্রম।

পরখম — জনাই গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে এই স্থানে কৃষ্ণকে সখাদের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করতে দেখে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করণের জন্য সংকল্প নেন।

চৌমুহা — পরখমের দেড় মাইল পশ্চিমদিকে এই স্থানে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করেছিলেন এবং তাঁর পাদপদ্মে সাশ্রুনয়নে করজোড়ে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। কাছেই জি টি রোড।

অজন্মা শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন

অষ্ট বসুর মধ্যে প্রধান বসুর নাম দ্রোণ। তাঁর পত্নীর নাম ধরা। তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না। বিষ্ণুভক্ত দ্রোণ দেবরাজ্য শাসন করতেন। একদিন পুত্র লাভের জন্য দ্রোণ ব্রহ্মার আদেশে ভার্যার সঙ্গে মন্দর পর্বতে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁরা কোনদিন ফলমূল, কোনদিন শুকনো পাতা, কোনদিন কেবল জল, কোনদিন সম্পূর্ণ নির্জলা উপবাস করে নির্জনে থেকে তপস্যা করতে লাগলেন। অযুতবর্ষ অতিবাহিত হলো। সেখানে ঘোর তপস্যার ফলে দুজন উইপোকার ঢিবিতে ঢাকা পড়ে গেলেন। দশ হাজার বছর ব্যাপী এভাবে তপস্যার পর ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে সেখানে এসে তাঁদেরকে বললেন, তোমরা বর গ্রহণ করো।

দ্রোণ ও ধরা সেই ঢিবি থেকে বেরিয়ে ব্রহ্মাকে পূজা ও প্রণাম করলেন। দ্রোণ হর্ষভরে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! পরিপূর্ণতম জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পুত্র হউন এবং যে ভক্তি দিয়ে নিশ্চিতরূপে দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, আমাদের সর্বদা সেই প্রেমলক্ষণা-ভক্তির উদয় হোক। অন্য কোনও বর চাই না।'

ব্রহ্মা বললেন, আমার নিকটে যা প্রার্থনা করেছো, তোমাদের এ বর দুর্লভ ও দুর্ঘট বটে; তবুও তোমাদের আগামী জন্মে তা সফল হবে।

তারপর পৃথিবীতে দ্রোণ ও ধরা জন্ম নিলেন নন্দ ও যশোদা রূপে।

আবার স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি সুতপা ও তাঁর পত্নী পৃশ্নিকে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে বললে তাঁরা প্রজা সৃষ্টি করবার আগে অরণ্যে নিরম্বু উপবাসী থেকে বারো হাজার বছর ব্যাপী কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন, মন্বন্তর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তখন তাঁরা ভগবান শ্রীহরির দর্শন লাভ করলেন। শ্রীহরি তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করতে চাইলে পৃশ্নি বললেন, আপনার মতো সন্তান যেন আমার উদরে জন্মগ্রহণ করে। তখন শ্রীহরি তিনবার সত্য করে বললেন, তথাস্তু, তথাস্তু, তথাস্তু।

ভগবান যেহেতু অসমোর্ধ্ব, তাঁর সমান বা তাঁর ঊর্ধ্বে কেউ নেই, তাই স্বয়ং পুত্র রূপে ভগবান তাঁদের তিনবার পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন। প্রথমবারে সুতপা-পৃশ্নির পুত্ররূপে, নাম হলো পৃশ্নিগর্ভ। দ্বিতীয়বারে সেই সুতপা-পৃশ্নি কশ্যপ ও অদিতি হলে তাঁদের পুত্ররূপে। দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বলে তাঁর নাম উপেন্দ্র এবং খর্ব আকৃতির বলে নাম বামন। তৃতীয়বারে সেই সুতপা-পৃশ্নি হন বসুদেব ও দেবকী। তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

দেবকীতে ভগবান অধিষ্ঠিত হলেন, শ্রীকৃষ্ণগর্ভা দেবকীর অঙ্গচ্ছটায় সমগ্র কারাগৃহ উদ্ভাসিত হলো। ব্রহ্মা, শিব, নারদ প্রমুখ মুনি ও দেববৃন্দ তখন দেবকী গর্ভ স্তুতি করতে লাগলেন। হে পরমেশ্বর, আপনি সমগ্র জগতের জীবের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে সজ্জন পালন ও দুর্জন নাশন করে থাকেন। হে

সর্বদুঃখহারি, আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আপনি পৃথিবীর ভার অপনীত করেছেন। এভাবে নানা স্তুতি ও পুষ্পবর্ষণ পূর্বক তাঁরা অন্তর্হিত হলেন।

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে ভগবান আবির্ভূত হলেন। বসুদেব দেখলেন চতুর্ভূজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভমনি, পরণে পীতবসন, অঙ্গকান্তি জলভরা মেঘের মতো শ্যামল, মস্তকে বৈদুর্য মনি খচিত মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কোমরে কাঞ্চি, বাহুতে বাজু, হাতে চুড়ি, চরণে নুপুর। অঙ্গে অদ্ভুত জ্যোতি। বসুদেব-দেবকী তাঁকে ভগবান জেনে স্তব ও প্রণতি নিবেদন করলেন।

ভগবান দেবকী-বসুদেবকে বললেন, আজই আমাকে নন্দগৃহে রেখে নন্দের সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে আসুন। তাহলে কংস থেকে আপনাদের ভয় থাকবে না। আপনারা সুখী হবেন।

এই বলে ভগবান সাধারণ মানব শিশু রূপ ধারণ করলেন। তারপর সেই বাচ্চাকে বসুদেব একটি ঝুড়িতে করে নন্দালয়ে রেখে আসতে উদ্যত হলেন। তিনি বুঝতেই পারলেন না যে, তাঁর হাত পায়ের শিকল কিভাবে খুলে গেল, কারাগারের সাতটি লোহার দরজা কিভাবে খুলে গেল।

গভীর রাতে খরস্রোতা যমুনা অতি সহজে পার হয়ে গিয়ে তিনি নন্দালয়ে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে নিদ্রাচ্ছন্না যশোদার পাশে পুত্রকে রেখে কন্যাকে তুলে নিয়ে কারাগারের মধ্যে এসে পৌঁছলেন। তখন পূর্বের মতোই দরজা আটকে গেল, হাত-পায়ের বেড়ি পূর্বের মতোই লেগে থাকল।

ব্রহ্মার বাক্য রক্ষার্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার পুত্র রূপেই গোকুলে আবির্ভূত হলেন। যশোদা প্রসবশ্রমে কাতর হয়ে নিদ্রিত ছিলেন। তাই জানতেই পারলেন না, তার পুত্র কিংবা কন্যা হয়েছে।

এদিকে মথুরার কারাগার মধ্যে নবজাত শিশুর কান্না শুনে নিষ্ঠুর কংস শিশুকন্যাটিকে তুলে আছাড় দিতে উদ্যত হলো। অমনি সহসা সেই দিব্য দর্শনা কন্যা অষ্টভূজা, নানা অস্ত্রধারিণী, পার্ষদ পরিসেবিতা, সহস্র অশ্ব সংযোজিত দিব্যরথে বিরাজিতা হলেন। তাঁকে দেখে কংস অবাক হলো। শত সূর্য প্রভা সমন্বিতা সেই মায়াকন্যা মেঘ গম্ভীর স্বরে কংসকে বললেন, তোকে যে বধ করবে সেই শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র জন্ম নিয়েছে। তুই মূর্খ অনর্থক দেবকীকে কষ্ট দিচ্ছিস্। এই বলে দেবী অন্তর্হিতা হলে দেবকী-বসুদেবের কাছে গিয়ে কংস ক্ষমা চেয়ে বললো, তোমরা আমার কথা শোনো। দেবতারা বলেছিল, তোমাদের পুত্রই আমাকে বধ করবে। তাই আমি তোমাদের সব পুত্রকে মেরে ফেলেছি। কিন্তু জানবে এসব কালের দ্বারাই সবকিছু ঘটছে। আমি দেববাক্য বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন দেখেছি যে, দেবতারাও মিথ্যাবাদী। মহামায়ার কথাও বুঝলাম না, আমার শত্রু নাকি অন্যত্র জন্ম নিয়েছে।

এদিকে গোকুলে নন্দপুত্রের জন্ম সংবাদে গোকুলবাসীরা আনন্দিত। একদিন গর্গ মুনি নন্দভবনে এসে নন্দপুত্রের নামকরণ করলেন। তিনি বললেন চারিযুগে এই শিশু শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু বর্তমানে দ্বাপরের অবসানে কৃষ্ণরূপ হয়েছে। তাই কৃষ্ণ নামে খ্যাত হবে। ইনি বসু বা ইন্দ্রিয়ের দেবতা, তাই এর নাম বাসুদেব। বৃষভানুর কন্যা রাধা যিনি কীর্তির গর্ভে জন্ম নিয়েছেন, ইনি স্বয়ং তাঁর পতি বলে ওর নাম রাধাপতি। এই আমি কয়েকটি নাম বললাম। কার্যক্ষেত্রে এই শিশুর অসংখ্য নাম প্রকাশিত হবে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সংবাদ

ললিতা বিশাখা কহে, হে রাধিকা
যারে চিন্ত নিরবধি।
গাহ যে সর্বথা যাঁর গুণগাথা
দেখেছি সে গুণনিধি।।
প্রতি ভোরে আসে সঙ্গীদের সাথে
বরষাণে গোচারণে।
কি যে নিদারুণ দেখিবার মতো
আঁকা যে হৃদ্‌গগনে।।
রাধা বলে, শোন মোর সখিগণ
সে ছবি আঁকি দেখাহ।
মনোজ্ঞ শ্রীচিত্র হেরিয়া রাধার
অশেষ আনন্দ হয়।।
একদিন তাঁরা বাহিরে হেরিলা
নন্দনন্দন হরি।
মধুর মুরতি সুন্দর অতি
রাধিকার মনোহারী।।
শ্যামরূপ হেরি রাধিকা সুন্দরী
হইলা যে মুরছিত।
তাঁরে লঞা কোলে সুস্থ করি তোলে
সখিগণ কহে কত।।
কেন তুমি এত বিহ্বল ব্যথিত
দুঃখিত ভাব নাশো।
যদি আশা করো সে শ্যামসুন্দরে
দৃঢ় চিত্তে ভালোবাসো।।
কহয়ে রাধিকা (হে) ললিতা বিশাখা
তোমরা যাই বা কহ।
যদি নাহি পাই আমার কানাই
রাখিব না এই দেহ।।

ললিতা তখন বিহ্বল মন
চলয়ে যমুনাতীরে।
কদম্বের মূলে পিক ধ্বনি তুলে
মাধবীলতার নীড়ে।।
নিরিবিলি বনে শ্রীনন্দনন্দনে
দেখিয়া ললিতা সখী।
কৃষ্ণের কাছে কহে ধীরে ধীরে
রাধিকার দশা কি।।
প্রথম যেদিন তোমার রূপ
হেরিলা নয়ন ভরি।
হইলা কাঠের পুতুলের মতো
বৃষভানু কুমারী।।
কারো সাথে তার নাহি কথা আর
নাহি চায় কারো দিকে।
নাহি কোন তার সাজগোজ আর
থাকে সদা মনোদুঃখে।।

একটি মাত্র তোমার কাছে
এই নিবেদন করি।
কৃপা করি তার দুঃখের ভার
হরণ করো শ্রীহরি।।
শুনেছি সবার কোনও বৃত্তান্ত
নাহি তব অবিদিত।
জানি জগতের সৃষ্টি স্থিতি
পালন তোমার কৃত।।
সকলের প্রতি সমদর্শী তুমি
তবুও ভক্তের প্রতি।
স্বাভাবিক মন তার দিকে জানি
তোমার অধিক প্রীতি।।
ললিতার বাণী শ্রীগোবিন্দ শুনি
কহে মধুর বচনে।
রাধা মনোভাব পূর্ণ হবে সব
শ্রীভাণ্ডীর বনে।।
এ সংসারে দেখ দুর্বুদ্ধি লোক
রাধিকা আর আমারে।
আলাদা ভাবিয়া ঈর্ষা করয়ে
কু-সমালোচনা করে।।
কালসূত্র নিরয়ে সে পতিত হয়ে
অশেষ যাতনা পাবে।
সর্বাঙ্গ তার লোহার তারে
কন্থা সেলাই হবে।।
মোদের একত্রে নিষ্ঠা সহকারে
উপাসিবে বুধজন।
ভব দশা ছাড়ি দিবে তারা পাড়ি
গোলোক বৃন্দাবন।।
নিস্কাম সেবাতে প্রেমানন্দে মাতে
আর কিছু নাহি চায়।
প্রিয় ভাজন মোর সেই জন
আনদিকে নাহি ভায়।।
সেই কথা শুনি ললিতা কৃষ্ণে
প্রণমে বারংবার।
আসি রাই কাছে কহে, হে রাধে
অভীষ্ট সিদ্ধ তোমার।।
সনিষ্ঠ অন্তরে প্রেম ভক্তি ভরে
করো তুমি কৃষ্ণকাম।
তোমরা দুজনে সুকৃতী জনের
পরম আনন্দ ধাম।।

— সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী